সঙ্গীতদর্শিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতদর্শিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত বিশারদ (লক্ষ্ণৌ)
অধ্যক্ষ—(গভর্ণমেণ্ট স্পন্সর্ড) ইন্‌ষ্টিটিউশন্ ফর দি
ট্রেনিং অব্ মিউজিক্ টিচার্স (উইমেন),
বেঙ্গল মিউজিক কলেজ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ও লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ সংযুক্ত)
ও আর্য্যসঙ্গীত বিদ্যাপীঠ কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
১লা আশ্বিন, ১৩৬৮
সাল

প্রকাশক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রামকৃষ্ণ আশ্রম, যাদবপুর
প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল মিউজিক কলেজ
১০নং ডোভার লেন, কলিকাতা-২৯

ছয় টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীতপন দত্ত
নিউ রিপাবলিক প্রেস
৬৭-বি হিদারাম ব্যানার্জী লেন,
প্রচ্ছদ শিল্পী—হরিপদ দাস
ব্লক বে: অটোটাইপ

উৎসর্গ

একদা যাঁহার সাহচর্যে আমার সঙ্গীত-জীবনের যাত্রা সুরু হয় সেই স্নেহময় অগ্রজ স্বর্গীয় ক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ভূমিকা ॥

সঙ্গীতজ্ঞানী শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ তাঁর "সঙ্গীতদর্শিকা" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশের বিচিত্র গীতধারা ও গীতরীতির সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত ভারতীয় সঙ্গীতের শিল্পীদের জীবনকথার সমাবেশ করেছেন সহজ ও সুন্দর ভাবে। সঙ্গীতদর্শিকার প্রথম ভাগ এরই আগে সঙ্গীত সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু মূল্যমান। বিচক্ষণ গ্রন্থকার সরল ভাষায় মঙ্গলগীতি, চর্যাগান, কৃষ্ণকীর্তন, নামকীর্তন, পদাবলীকীর্তন, বাউল, পাঁচালী, নাচাড়ি, দাঁড়াকবি, বৈঠকীগান, কথকতা, যাত্রাগান প্রভৃতি অভিজাত ও দেশী তথা লোকগীতির পরিচয় দিয়েছেন যেগুলি বাংলাদেশের সঙ্গীতশিল্পসংস্কৃতির জগতে অমূল্য। এই সকল গীতির রূপভেদ ও রীতির পরিচয়দান ছাড়া তিনি প্রাচীন প্রখ্যাত পদকর্তা, গীতশিল্পী ও সঙ্গীত-শাস্ত্রীদের জীবনকাহিনী তাঁর গ্রন্থের অঙ্গীভূত করেছেন। সঙ্গীতের ঐতিহাসিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এগুলি অপরিহার্য। গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, শ্রীচৈতন্য, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি ; দত্তিল, শার্ঙ্গদেব, কল্লিনাথ, পণ্ডিত অহোবল, সোমনাথ, দামোদর ; রাজা মানসিংহ, স্বামী হরিদাস, মিঞাঁ তানসেন, আমীর খস্রৌ, সদারঙ্গ, নিয়ামত খাঁ, পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক সাধক-কবি, সঙ্গীতশাস্ত্রী ও শিল্পীদের জীবনকাহিনী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গীতরীতি এবং ধারারও তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হোলেও উপাদানে সমৃদ্ধ।

ভারতীয় গীতশ্রেণীর অন্যতম সম্পদ বাংলাগানের নিজস্ব একটি রূপ ও প্রকাশভঙ্গি আছে। বাংলাদেশের শ্যামল সুন্দর পরিবেশ ও সরস প্রকৃতিকে নিয়েই শুধু সঙ্গীত কেন, বাংলার সাহিত্য, কাব্য, চিত্রকলা,

ভাস্কর্য এবং ধর্মও গড়ে উঠেছে। বাংলার সমাজপরিবেশ বিশেষভাবে লোকসংস্কৃতির মর্মকথাই প্রকাশ করে। বাংলার গান, তাল ও নৃত্যের মধ্যেও একটি বিশেষ রীতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাংলার শাক্তপদাবলী, সাধনসঙ্গীত, পদাবলীকীর্তন ও বিচিত্র তালের ভঙ্গি ভারতীয় সঙ্গীতের জগতে এক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন বাংলায় ও বিশেষ কোরে গুপ্ত ও পাল যুগে দেবমন্দিরগুলি সঙ্গীতশিক্ষা সাধনার, পীঠস্থান হিসাবে গণ্য ছিল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কাশ্মিরী ঐতিহাসিক কহ্লন রাজতরঙ্গিনীতে নাকি এ'সবের উল্লেখ করেছেন।

বাংলার পালগীতি ও নাথগীতিকার লক্ষ্য ও সার্থকতা সামান্য ভিন্ন হোলেও লোকশিল্পসংস্কৃতিরই তারা অঙ্গ। নাথগুরুদের সাধনগীতি তথা গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, গোপীচাঁদের পাঁচালী প্রভৃতি নাথগীতির নিদর্শন। লোকগীতি অধ্যাত্ম পথের দিশারী।

খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকের বজযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চর্যা এবং বজ্রগানও অধ্যাত্ম সাধনা ও প্রেরণার সচল উৎস রূপে গণ্য ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকের সঙ্গীতগুণী 'সঙ্গীত-রত্নাকর' গ্রন্থে মঙ্গল, ধবল, রাহড়ী প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে চর্যাকেও প্রবন্ধশ্রেণীর গান হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকের গোড়ার দিকে গীতগোবিন্দের পদগান ছিল প্রবন্ধগীতি। গীতগোবিন্দে শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের সমাবেশ ছিল। শাস্ত্রীয় নৃত্যও ছিল তার অঙ্গ। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত নামকীর্তন, ঠাকুর নরোত্তমপ্রবর্তিত লীলা-কীর্তন বা রসকীর্তন, পরবর্তী পাঁচালীর ভঙ্গিতে মধুসূদন কিন্নর বা মধুকানের ঢপকীর্তন, তখনকার সমাজে রামায়ণগান, চণ্ডীর গান, কালীকীর্তন, মনসার গান, এবং তাছাড়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্ত সাধকদের শ্যামাসঙ্গীত, রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর বাংলা টপ্পাগান, রাম বসুর কবিগান, দাশরথি রায়ের পাঁচালী এবং আরো কত শত রকমের

গান বাংলার সমাজে প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালীর দুর্গামণ্ডপ ও চণ্ডীমণ্ডপ ছিল তখন আনন্দ-সমারোহের কেন্দ্র। পল্লীসংগঠন, ধর্মালোচনা, বিতর্ক-স্থান প্রভৃতি ছাড়াও আমোদপ্রমোদের প্রাণকেন্দ্র রূপে ঐ সব চণ্ডীমণ্ডপের হোত ব্যবহার।

বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র লোকগীতের হয়েছিল বিকাশ। সমাজ-মনে তাদের প্রভাবও ছিল কম নয়। এক কথায় বাংলার প্রাত্যহিক জীবনধারা ছিল ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত বিচিত্র নৃত্য, গীত ও বাদ্য তথা আনন্দানুষ্ঠানের সঙ্গে। কুমারীদের ভাদুবন্দনা ও ভাদুগান, টুসুগান, বিভিন্ন ব্রতোৎসবে ছড়ার আকারে সহজ সরল গান ও ছান্দায়িত নৃত্য, ঝুমুরগান, ভাঁজোগান, ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, জারি, সারি, বাউলগান বাংলার স্বতন্ত্র ও স্বচ্ছন্দ জীবনের নিদর্শন।

তবে ভারতের সকল দেশের লোকগীতির রূপ, বিকাশভঙ্গি ও প্রকৃতি প্রায় একই ধরণের। লোকগীতি বা পল্লীগীতির রূপকে আশ্রয় কোরেই ক্রমবিকাশের পথে অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল গীতিরূপের বিকাশ হয়েছিল। চিরদিন অনুন্নত থেকেই উন্নত রূপের হয় বিকাশ এবং এই বিকাশ ও বিস্তৃতির মধ্যে থাকে অসংখ্য ভাঙ্গাগড়ার নিত্য-নূতন রূপ ও বিবর্তনের ধারা। সুপ্রাচীন আদিম অনুর্বর গীতিই প্রাগৈতিহাসিক যুগ অতিক্রম কোরে বৈদিক যুগে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নূতনতার মিশ্রণ, উদ্‌ভাবন ও পরিবর্ধন হয়েছিল তাতে যথেষ্ট। বৈদিকের পর এলো গান্ধর্বগানের যুগ। গান্ধর্বগানকেই বলা হোত মার্গসঙ্গীত। এই গান্ধর্ব বা মার্গগীতিশ্রেণীর অনুশীলন বিলুপ্ত হোল ভরতোত্তর যুগে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৫ম-৭ম শতকে। এই ৫ম-৭ম শতকেই আবিভূত হন সঙ্গীতশাস্ত্রী মতঙ্গ। মতঙ্গের আগেও কোহল, যাষ্টিক, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীরা জীবিত ছিলেন। ছাপার আকারে তাঁদের গ্রন্থ না পাওয়া গেলেও বৃহদ্দেশী, সঙ্গীতসময়সার, সঙ্গীত-রত্নাকর এবং

সিংহভূপালকৃত রত্নাকরের "সুধাকর" ও কল্লিনাথকৃত "কলানিধি" টীকা প্রভৃতিতে তাঁদের যে সকল প্রমাণবাক্যের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং তাথেকে জানা যায় অভিজাত দেশীরাগ বা রাগগীতির বিকাশ হয়েছিল ঠিক ভরতের পরবর্তীকালেই। অবশ্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে মগধদেশজাত মাগধী, অর্ধমাগধী গীতরীতির উল্লেখ আছে এবং এ'দুটি গীতি অভিজাত ধ্রুবা-নাট্যগীতির অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হোত। ধ্রুবাগান ছিল গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নাটকপ্রসঙ্গেই ছিল তার ব্যবহার। ক্রমে গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীতের অনুশীলন লোপ পেল এবং প্রচলিত হোল পরিশুদ্ধ দেশীসঙ্গীতের রূপ। আধুনিক সমাজে যে অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল গানের ও রাগের আমরা অনুশীলন করি এরা অভিজাত দেশীসঙ্গীতের শ্রেণী-ভুক্ত, মার্গসঙ্গীত মোটেই নয়। তবে একথাও আবার সত্য যে ভিন্ন ভিন্ন যুগে রাগে, তালে ও গীতিরূপে পরিবর্তন এলেও ঐতিহ্যবাহী এক আদর্শের অন্তর্নিবেশ আছে সকল শ্রেণীর মধ্যে আর তারি জন্য প্রতিটি রাগের ধ্যান ও মন্ত্র-রূপে বর্ণনাভেদ দেখা দিলেও সকলের মধ্যে আদর্শগত এক অখণ্ড আদর্শের ভাব স্পষ্ট দেখা যায়।

পরিশেষে একথা স্বীকার্য যে সঙ্গীতকার তথা কবি ও গীতিকারদের জীবনালেখ্যের সমাবেশ সঙ্গীত-ইতিহাসের এক অপরিহার্য উপাদান। ইতিহাসবাহী গীতিধারার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিচিত্র গায়নশৈলী ভাবমাধুর্য ও অলংকরণগীতি প্রভৃতিও সঙ্গীতশিল্পীদের জীবন উপাদানের সহচারী হোয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাতে কোরে বিভিন্ন যুগের গীতি ও রাগরূপ জিজ্ঞাসু ও শিক্ষাসেবীদের কাছে পূর্ণরূপ নিয়ে ধরা দেয়। বিচিত্র কালের দর্পণে পরিপূর্ণ সাঙ্গীতিক মূর্তিকে চিনে নেওয়ার তাঁরা সুযোগ পান। তবে একথা সত্য যে বিভিন্ন যুগের সঙ্গীতসাধক, শাস্ত্রী ও শিল্পীদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণপঞ্জীর অভাবে অনেক সময় নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হয়, কল্পনা এসে বাস্তবকে ম্লান করে যা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আদরণীয় নয়। বর্তমান গ্রন্থেও হয়তো অসাবধানতার

জন্য কিছু কিছু কোথাও কোথাও সন তারিখে ও ঘটনা সমাবেশে বিচ্যুতি দেখা যেতে পারে। কিন্তু তাহলেও গ্রন্থকার বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে সকল বিষয়গুলির আলোচনা করেছেন।

পরিশেষ সঙ্গীতজ্ঞানী শ্রীননীগোপাল বাবুকে আমরা অন্তরের অভিনন্দন জানাই তাঁর সময়োচিত এই প্রচেষ্টার জন্য। সঙ্গীতের ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিক সাধনা ও শাস্ত্র উভয় দিকেই জ্ঞান তাঁর প্রশংসনীয়। সঙ্গীতের বিস্তার ও সংগঠন-ক্ষেত্রেও দান তাঁর অপরিসীম। তাই এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রকাশ প্রচেষ্টা তাঁর সার্থক হোক সঙ্গীতগুণী ও সঙ্গীতসেবীদের কাছে সমাদর লাভ কোরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

গ্রন্থকারের নিবেদন

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব মহাশয়ের ইহলোকত্যাগ ও অপরাপর নানা প্রতিকূল অবস্থার দরুণ সঙ্গীতদর্শিকা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে অনিচ্ছা প্রসূত বিলম্ব ঘটিয়াছে ; এইজন্য আমি সবিশেষ দুঃখিত।

এই খণ্ডে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে তৎ-সমুদয়ই গ্রন্থের ভূমিকাতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে সুতরাং এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন বোধ করিলাম না। তবে এইটুকু বলা আবশ্যক যে সামগ্রিক ভাবে সঙ্গীতের উপাধি পরীক্ষায় শিক্ষণীয় সকল বিষয়েরই যথা সম্ভব আলোচনা ইহাতে আছে এবং গ্রন্থখানি বি, মিউজ, থ্রি, ইয়ার্স্ ডিগ্রি কোর্স্, সঙ্গীত বিশারদ ও অন্যান্য উপাধি পরীক্ষার্থীদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে বলিয়াই আমি আশাকরি।

ভারতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদিগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিক্‌পাল সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ সঙ্গীতদর্শিকা দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থের শ্রী ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও নিবিড় স্নেহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া নিকটতর করিয়াছেন। এই ত্যাগী মহান্ সন্ন্যাসীর নিঃস্বার্থ স্নেহ আমার জীবনে সর্বদাই প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে এই বিশ্বাস আমি রাখি।

শ্রদ্ধেয় সঙ্গীত-বিদ্বান ডাক্তার অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় এই গ্রন্থোক্ত কোন কোন বিষয়ে আমাকে যথাযোগ্য উপদেশ দানে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বাংলার লোক-সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও গীতকার শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সঙ্গীতদর্শিকার দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়নে প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া আমাকে আশাতীত রূপে সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার নিকট চিরঋণী রহিলাম। প্রশস্তিবাদ দ্বারা তাঁহার ঔদার্য্যকে খর্ব করিতে চাহিনা।

আমার বিশিষ্ট বন্ধু প্রফেসার শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, বন্ধুবর শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও স্নেহভাজন শ্রীমান অরবিন্দ বিশ্বাস এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে সবিশেষ সহায়তা করায় তাঁহাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে স্নেহভাজন সঙ্গীত বিশারদ শ্রীমান অজিত চট্টোপাধ্যায় সঃ বিঃ শ্রীমান পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, সঃ বিঃ শ্রীশক্তিময় পাল, সঃ বিঃ শ্রীমতী মীনাক্ষী বসু, ও সঃ বিঃ শ্রীমতী পূরবী দত্ত এই গ্রন্থের কার্য্যে নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমার ঐকান্তিক আশীর্বাদ জানাই, বিশেষ করিয়া স্নেহভাজন শ্রীমান অজিত-চট্টোপাধ্যায় অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলনে আমাকে যে সাহায্য দান করিয়াছেন তাহা আমার মনে সর্বদাই অঙ্কিত থাকিবে।

প্রিয় সুহৃদ শ্রীহরিপদ দাস এই পুস্তিকার প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্য তিনিও ধন্যবাদার্হ।

কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে এই গ্রন্থ সঙ্কলনে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে-রচিত কতিপয় গ্রন্থ, পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ লিখিত "হমারে সঙ্গীত রত্ন" কুমার বীরেন্দ্রকিশোর লিখিত "হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" শ্রীজয়দেব রায় লিখিত "সঙ্গীত-পরিক্রমা" ও অপরাপর বহু সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

গ্রন্থখানিতে মুদ্রণজনিত বা তদতিরিক্ত ভুল ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে ; সহৃদয় পাঠক পাঠিকা আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক অবহিত করিলে বাধিত হইব এবং ভুল ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইব। সঙ্গীতদর্শিকা দ্বিতীয় খণ্ড ও প্রথম খণ্ডের ন্যায় জনসাধারণ ও বিশেষ করিয়া সঙ্গীত শিক্ষার্থীদিগের উপকারে আসিলে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

১লা আশ্বিন ১৩৬৮ সাল
রামকৃষ্ণ আশ্রম
যাদবপুর, কলিকাতা—৩২

বিনীত—
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র –

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৩	১২	চতুর্থ	চতুর্দ্দশ
১২৫	১	চতুর্থ	,,
১২৫	১৫	পঞ্চম	পঞ্চদশ
১২৮	১৮	পঞ্চদশ	দ্বাদশ
১৩৬	১	তা	তানসেন
১৪৭	২০	ব্যঙ্কটমখ	ব্যঙ্কটমখী

সূচীপত্র

সংগীতদর্শিকা

প্রথম অধ্যায়

"শ্রুতি ও স্বরস্থান"

এতদ্দেশীয় প্রাচীন সংগীতবিদ্গণ সংগীত শাস্ত্র লিখিবার সময় প্রথমতঃ শ্রুতি এবং স্বরের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া তৎপর ঠাট এবং রাগের বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রণীত সমস্ত গ্রন্থেই এই রীতি দেখা যায়। আমাদিগকে এখন দেখিতে হইবে যে প্রাচীন গ্রন্থকারের শ্রুতি এবং স্বরস্থান কিরূপ ছিল এবং আজকালই বা উহার ব্যবহার কিরূপ হইয়া থাকে। শ্রুতি ও স্বরস্থান বিষয়ে যে সব পণ্ডিতদের মতামত বিচার করিতে হইবে তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

গ্রন্থকারের নাম--	গ্রন্থের নাম—
(১) ভরত	নাট্যশাস্ত্র
(২) শার্ঙ্গদেব	সংগীতরত্নাকর
(৩) লোচন	রাগতরঙ্গিনী
(৪) অহোবল	সংগীতপারিজাত
(৫) হৃদয়নারায়ণদেব	হৃদয়প্রকাশ
(৬) শ্রীনিবাস	রাগতত্ত্ববিবোধ

ইহাদের সহিত পণ্ডিত ভাতখণ্ডে-রচিত "লক্ষণ-সংগীত" এবং "অভিনবরাগমঞ্জরী" নামে অভিহিত হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতির প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের বিচার করিতে হইবে।

ভরত ও শার্ঙ্গদেব অতি প্রাচীন এবং লোচন, অহোবল, হৃদয়নারায়ণদেব ও শ্রীনিবাসকে মধ্যকালের গ্রন্থকার বলিয়া মানা

হয়। লক্ষণসংগীত এবং অভিনবরাগমঞ্জরী এই গ্রন্থদ্বয়ে বর্ত্তমান সংগীত পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। ভরতের সময় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে, শার্ঙ্গদেবের সময় ত্রয়োদশ শতাব্দী, লোচনের সময় পঞ্চদশ শতাব্দী, অহোবলের সময় ষোড়শ শতাব্দী, হৃদয়নারায়ণের সময় সপ্তদশ শতাব্দী এবং শ্রীনিবাসের সময় অষ্টাদশ শতাব্দী বলিয়া মানা হয়।

প্রাচীন গ্রন্থকারগণ শ্রুতি সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন —"শ্রুয়তে ইতি শ্রুতিঃ"। সংগীত উপযোগী যে নাদ স্পষ্ট শ্রুতি গোচর হয় তাহাকে শ্রুতি বলে। শ্রুতিসংখ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন ও বর্ত্তমান গ্রন্থকারগণ একমত। "সা" হইতে তার "সা" পর্য্যন্ত সংগীতোপযোগী ২২টী নাদ বা শ্রুতি মানা হইয়াছে।

উপরোক্ত নাদের উপর সংগীতোপযোগী শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের স্থান নির্ণয় করা হইয়াছে। সাতটী শুদ্ধ স্বরের উপর নিম্নলিখিত শ্রুতি মানা হইয়াছে।

"চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়জমধ্যমপঞ্চমাঃ।
দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রি ঋষভধৈবতৌ"॥

অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম এই তিনটী স্বরের চারিটী করিয়া, নিষাদ এবং গান্ধারের দুইটী করিয়া, ঋষভ এবং ধৈবতের তিনটী করিয়া শ্রুতি মানা হইয়াছে। বর্ত্তমানকালের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর প্রাচীনকালের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ; কারণ প্রাচীনকালে শুদ্ধস্বর সমূহ অন্তিম শ্রুতির উপর স্থাপন করা হইত। বর্ত্তমানে প্রথম শ্রুতির উপর শুদ্ধস্বর স্থাপন করা হয়।

শ্রুতি নং	শ্রুতির নাম	প্রাচীনকাল	বর্ত্তমানকাল
১	তীব্রা	...	ষড়জ
২	কুমদ্বতী	...	...
৩	মন্দা	...	...
৪	ছন্দোবতী	ষড়জ	...
৫	দয়াবতী	...	ঋষভ
৬	রঞ্জনী	...	...
৭	রক্তিকা	ঋষভ	...
৮	রৌদ্রী	...	গান্ধার
৯	ক্রোধী	গান্ধার	...
১০	বজ্রিকা	...	মধ্যম
১১	প্রসারিণী	...	...
১২	প্রীতি	...	...
১৩	মার্জনী	মধ্যম	..
১৪	ক্ষিতি	...	পঞ্চম
১৫	রক্তিকা	...	...
১৬	সন্দিপিনী	...	...
১৭	আলাপিনী	পঞ্চম	...
১৮	মদন্তী	...	ধৈবত
১৯	রোহিণী	...	..
২০	রম্যা	ধৈবত	...
২১	উগ্রা	...	নিষাদ
২২	ক্ষোভিণী	নিষাদ	...

শ্রুতি এবং স্বরস্থানকে ধ্বনির দৃষ্টিতে বিচার করিবার জন্য তুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে অতি প্রাচীন গ্রন্থকারদ্বয় ভরত এবং শার্ঙ্গদেব, দ্বিতীয় ভাগে মধ্যকালীন গ্রন্থকারগণ লোচন, অহোবল, হৃদয়নারায়ণদেব ও শ্রীনিবাস। তন্মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ২২টী শ্রুতি সমদূরত্বে অবস্থিত বলিয়া মানিতেন। তাঁহাদের শ্রুতি ও স্বরস্থান আমাদের সংগীতোপযোগী নহে মধ্যকালীন গ্রন্থকারদের লিখিত শ্রুতি ও স্বরস্থানের সহিতই বর্ত্তমানের শ্রুতি ও স্বরস্থানের বিচার করা বিধেয়।

লোচন, অহোবল প্রভৃতি পণ্ডিতদের সময় পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী মানা হইয়াছে। উপরোক্ত পণ্ডিতগণ প্রধান ১২টী স্বরের সাহায্যে তাহাদের পদ্ধতি বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত শ্রুতি সমান বলিয়া মানিতেন না। তাঁহারা পরম্পরাগত নিয়মানুযায়ী ১২টী স্বর মানিয়া লইয়া শাস্ত্রোক্ত সংখ্যানুযায়ী শ্রুতি বিভাজন করিতেন। পণ্ডিত ভাবভট্ট-রচিত "অনুপ-বিলাস" গ্রন্থে দেখা যায় যে গ্রন্থকার সমস্ত শ্রুতি সমদূরত্ব বলিয়া মানিতেন না। লোচন, অহোবল ও শ্রীনিবাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের শ্রুতি ও স্বরস্থান সম্বন্ধে বিচার একই প্রকারের; অতএব শ্রীনিবাসের স্বরস্থান—বিচার আলোচনা করিলেই চলিবে।

আধুনিক সংগীতের প্রতিনিধি হিসাবে "অভিনবরাগমঞ্জরী" গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে মানিয়া লওয়া যায়।

ধ্বনির দৃষ্টিতে শ্রুতি স্বরস্থান নির্ণয়ের তুইটী প্রচলিত প্রণালী আছে।

(১) বীণার তারের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্বরস্থান নির্ণয় করা।

(২) ধ্বনির প্রতি সেকেণ্ডে তুলনাত্মক আন্দোলনের সাহায্যে স্বরের নির্ণয় করা।

প্রাচীন গ্রন্থকারদের এই দ্বিতীয় পদ্ধতি জানা ছিল না। পণ্ডিত শ্রীনিবাসের রাগতত্ত্ববিবোধ-বর্ণিত নিয়মানুসারে যদি বীণার তারের দৈর্ঘ্য ৩৬" ইঞ্চি মানা হয় তাহা হইলে অতি সহজেই স্বরস্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে। স্বর রচনার মূল তত্ত্ব "ষড়জ—পঞ্চম ভাব" ঠিক রাখা।

যথা ঃ— সা — প, রে — ধ, গ — নি, ম — র্সা।

অর্থাৎ বীণাতে উত্তরাঙ্গের স্বর পূর্বাঙ্গস্বরের পঞ্চম হইবে। গ্রীস্‌দেশের লাইকো কোরান্‌ নামীয় জনৈক দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ "Harmony of the fifth" অর্থাৎ "ষড়জ-পঞ্চম ভাব" বাহির করেন। ইহার অর্থ এই যে, সা হইতে প এর দূরত্বের যেমন সম্বন্ধ তেমনি রে ও ধ, এবং গ ও নি ইত্যাদির সম্বন্ধ একই প্রকারের।

বীণার তারের উপর শ্রীনিবাসের শুদ্ধ স্বর কি করিয়া বাহির করিতে হইবে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

সা ··· ৩৬" ইঞ্চি। পূর্ব মেরু ।——————————। উত্তর মেরু (ঘুরচ)

সা—৩৬" ইঞ্চি ÷ ২ = ১৮"।

র্সা

(পূর্ব মেরু) ৩৬" ।—————————— ——। ঘুরচ (উত্তর মেরু)

১৮"

তার র্সা ও উত্তর মেরুর মধ্যস্থানে ১৮" ÷ ২ = ৯" সা̈ (অতি তার)

সা র্সা সা̈

————————————————————————। (ঘুরচ)

৩৬" ১৮" ৯"

মধ্যম—

সা̇ হইতে তার সা এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ম হইবে।

৩৬″ — ১৮″ = ১৮″

১৮″ ÷ ২″ = ৯″

৩৬″ — ৯″ = ২৭″ = "ম"

৩৬″ ২৭″ ১৮″

——————————————————————— ঘুরচ

সা ম সা̇ সা̈

পঞ্চম—

সা ও তার সা̇ এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ ছাড়িয়া উত্তর ভাগে পঞ্চম হইবে।

৩৬″ − ১৮″ = ১৮″ ÷ ৩ = ৬″ × ২ = ১২″

৩৬″ − ১২″ = ২৪″ = "প"

৩৬″ ২৪″ ১৮″

———————————————————————

সা প সা̇

গান্ধার—গ্‌

সা ও প এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে গ্‌ হইবে।

৩৬″ − ২৪″ = ১২″ ÷ ২ = ৬″ ; ৩৬″ − ৬ = ৩০″ = "গ্‌"

৩৬″ ৩০″ ২৪″ ১৮″

———————————————————————

সা গ্‌ প সা̇

ঋষভ—

সা ও প এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া উত্তর ভাগের দুই ভাগ ছাড়িয়া পূর্ব ভাগে রে হইবে।

৩৬″ − ২৪″ = ১২″ ÷ ৩″ = ৪″ ; ৩৬″ − ৪″ = ৩২″ = "রে"

৩৬″	৩২″	২৪″	১৮″
সা	রে	প	র্সা

ধৈবত—

পঞ্চম ও তার র্সা এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ধ হইবে।

২৪″ − ১৮″ = ৬″ ÷ ২″ = ৩″· ২৪″ − ৩″ = ২১″

উপরোক্ত ধৈবতের স্থান সম্বন্ধে মত ভেদ আছে।

"পঞ্চমোত্তর ষড়জাখ্য মধ্যে" এই <u>মধ্যে</u> কথাটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। ঠিক মধ্যে বা মধ্যের যে কোন স্থানে। অতএব প ও সা এর মধ্যে প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিতে হইলে "ষড়জ-পঞ্চম—ভাব" দ্বারা প্রকৃত স্থান নির্ণয় করা উচিত।

যথা— সা ঃ প = রে ঃ ধ ; ৩৬″ ঃ ২৪″ = ৩২″ ঃ ধ

$\therefore$ ধ $= \frac{২৪'' \times ৩২''}{৩৬''} = \frac{৬৪}{৩} = ২১\frac{১}{৩}''$ তে ধৈবতের প্রকৃত স্থান

৩৬″	৩২″	২৪″	২১⅓″	১৮″
সা	রে	প	ধ	র্সা

পঞ্চম ও তার সা̇ এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ ছাড়িয়া উত্তর ভাগে নি̱ হইবে।

২৪″ − ১৮″ = ৬″ ÷ ৩ = ২″ + ২″ = ৪″

২৪″ − ৪″ = ২০″ = "নি̱"

৩৬″	২৪″	২০″	১৮″
সা	প	নি̱	সা̇

এখন মনে রাখিতে হইবে যে পণ্ডিত শ্রীনিবাসের শুদ্ধ ঠাটকে বর্ত্তমানে আমরা কাফি ঠাট মানিয়া থাকি।

———

শ্রীনিবাসের শুদ্ধ স্বর, তারের দৈর্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যা—

স্বর	স্বরসমূহের নাম	তারের দৈর্ঘ্য	আন্দোলন সংখ্যা
সা	ষড়জ (মধ্যসপ্তক)	৩৬″	২৪০
রে	ঋষভ (মধ্যসপ্তক)	৩২″	২৭০
গ	গান্ধার (মধ্যসপ্তক)	৩০″	২৮৮
ম	মধ্যম (মধ্যসপ্তক)	২৭″	৩২০
প	পঞ্চম (মধ্যসপ্তক)	২৪″	৩৬০
ধ	ধৈবত (মধ্যসপ্তক)	২১$\frac{৩}{৫}$″	৪০৫
নি	নিষাদ (মধ্যসপ্তক)	২০″	৪৩২
সাঁ	ষড়জ (তারসপ্তক)	১৮″	৪৮০
সা̈	ষড়জ (অতি তারসপ্তক)	৯″	৯৬০

শ্রীনিবাসের বিকৃত স্বর কি করিয়া বাহির করিতে হইবে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

কোমল--রে̱

মধ্য সা (পূর্ব মেরু) এবং শুদ্ধ রে পর্য্যন্ত তারের দৈর্ঘকে তিন ভাগ করিয়া সা হইতে দ্বিতীয় ভাগে রে̱ হইবে।

$$৩৬'' - ৩২'' = ৪'' \div ৩ = \frac{৪}{৩} \times ২ = \frac{৮}{৩}\ ;\quad ৩৬'' - \frac{৮}{৩}''$$

$= \frac{১০৮-৮}{৩} = \frac{১০০}{৩} = ৩৩\frac{১}{৩}'' =$ "<u>রে</u>" হইবে।

(পূর্ব মেরু) ৩৬″ ——— ৩৩⅓″ ——— ৩২″

সা — <u>রে</u> — রে

তীব্র গান্ধার—

পূর্ব মেরু ও ধৈবতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে "গ" হইবে।

$= ৩৬'' - \frac{৬৪''}{৩} = \frac{১০৮-৬৪}{৩} = \frac{৪৪^{২২}}{৩} \times \frac{১}{২} = \frac{২২''}{৩},\ ৩৬ - \frac{২২''}{৩}$

$= \frac{১০৮-২২}{৩} = \frac{৮৬}{৩} = ২৮\frac{২''}{৩} =$ "গ"

৩৬″ ——— ২৮⅔″ ——— ২১⅓″

সা — গ — ধ

তীব্র মধ্যম—

গ ও সাঁ এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া দ্বিতীয় ভাগে তীব্র মধ্যম হইবে।

$\frac{৮৬''}{৩} - ১৮'' = \frac{৮৬-৫৪}{৩} = \frac{৩২}{৩};\quad \frac{৩২}{৩} \div ৩ = \frac{৩২}{৩} \times \frac{১}{৩} = \frac{৩২''}{৯};$

$\frac{৮৬''}{৩} - \frac{৩২''}{৯} = \frac{২৫৮-৩২}{৯} = \frac{২২৬}{৯} = ২৫\frac{১}{৯}'' =$ ম'

২৮⅔″ ——— ২৫ $\frac{১}{৯}$″ ——— ১৮″

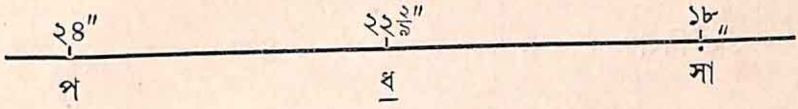
গ — ম' — সাঁ

কোমল ধৈবত—

প ও র্সা এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ ছাড়িয়া পূর্ব ভাগে কোমল "ধ" হইবে। ঠিক কোন্ স্থানে হইবে তাহা নির্ণয়ের জন্য "ষড়জ-পঞ্চম ভাব" দ্বারা বাহির করিলে উপরোক্ত স্বরটীর নির্দ্দিষ্ট স্থান পাওয়া যাইবে।

$$\text{সা} : \text{প} = \underline{\text{রে}} : \underline{\text{ধ}} \therefore \text{৩৬} : \text{২৪} = \frac{\text{১০০}}{\text{৩}} : \underline{\text{ধ}}$$

$$= \frac{\text{২৪}^{\text{২}} \times \text{১০০}}{\text{৩৬}^{\text{৩}} \times \text{৩}} = \frac{\text{২০০}}{\text{৯}} = \text{২২}\frac{\text{২}}{\text{৯}}''$$



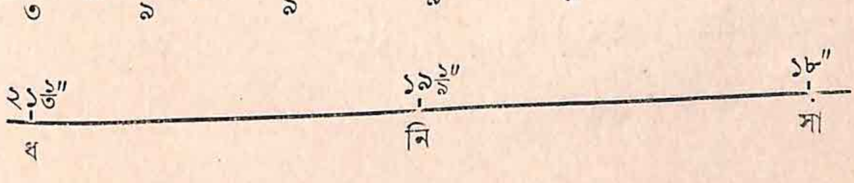
তীব্র নিষাধ—

ধৈবত ও তার র্সা এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া পূর্বের দুই ভাগের উত্তরে নি হইবে।

$$\frac{\text{৬৪}''}{\text{৩}} - \text{১৮}'' = \frac{\text{৬৪} - \text{৫৪}}{\text{৩}} = \frac{\text{১০}''}{\text{৩}};$$

$$\frac{\text{১০}}{\text{৩}} \div \text{৩} = \frac{\text{১০}}{\text{৯}} \times \text{২} = \frac{\text{২০}''}{\text{৯}};$$

$$\frac{\text{৬৪}''}{\text{৩}} - \frac{\text{২০}''}{\text{৯}} = \frac{\text{১৯২} - \text{২০}}{\text{৯}} = \frac{\text{১৭২}}{\text{৯}} = \text{১৯}\frac{\text{১}''}{\text{৯}} = \text{তীব্র নি।}$$



পণ্ডিত শ্রীনিবাসের পাঁচটী বিকৃতস্বর, তারের দৈর্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যা

স্বর	স্বর সমূহের নাম	তারের দৈর্ঘ্য	আঃ সংখ্যা
$\underline{\text{রে}}$	কোমল ঋষভ (মধ্যসপ্তক)	৩৩$\frac{১}{৩}$″	২৫৯$\frac{১}{৫}$
গ	তীব্র গান্ধার (,,)	২৮$\frac{২}{৩}$″	৩০১$\frac{১৭}{৪৩}$
ম̍	তীব্র মধ্যম (,,)	২৫$\frac{১}{৯}$″	৩৪৪$\frac{৮}{১৩}$
$\underline{\text{ধ}}$	কোমল ধৈবত (,,)	২২$\frac{২}{৯}$″	৩৮৮$\frac{৪}{৫}$
নি	তীব্র নিষাদ (,,)	১৯$\frac{১}{৯}$″	৪৫২$\frac{৪}{৪৩}$

মঞ্জরীকার (ভাতখণ্ডে) বর্ণিত ১২টী স্বর

স্বর	শুদ্ধ অথবা বিকৃত	তারের দৈর্ঘ্য	আঃ সংখ্যা
সা	শুদ্ধ	৩৬″	২৪০
$\underline{\text{রে}}$	কোমল (বিকৃত)	৩৪″	২৫৪$\frac{২}{১৭}$
রে	তীব্র (শুদ্ধ)	৩২″	২৭০
$\underline{\text{গ}}$	কোমল (বিকৃত)	৩০″	২৮৮
গ	তীব্র (শুদ্ধ)	২৮$\frac{২}{৩}$″	৩০১$\frac{১৭}{৪৩}$
ম	কোমল (শুদ্ধ)	২৭″	৩২০

স্বর	শুদ্ধ অথবা বিকৃত	তারের দৈর্ঘ্য	আঃ সংখ্যা
ম̍	তীব্র (বিকৃত)	২৫$\frac{১}{২}$″	৩৩৮$\frac{১৪}{১৭}$
প	(শুদ্ধ)	২৪″	৩৬০
ধ̲	কোমল (বিকৃত)	২২$\frac{২}{৩}$″	৩৮১$\frac{৩}{১৭}$
ধ	তীব্র (শুদ্ধ)	২১$\frac{১}{৩}$″	৪০৫
নি̲	কোমল (বিকৃত)	২০″	৪৩২
নি	তীব্র (শুদ্ধ)	১৯$\frac{১}{৯}$″	৪৫২$\frac{৪}{৪৩}$
সা̇	তার (শুদ্ধ)	১৮″	৪৮০

বিঃ দ্রঃ—প্রাচীন গ্রন্থকারদের সহিত মঞ্জরীকারের কোমল রে̲, কোমল ধ̲ ও তীব্র ম̍ এর দৈর্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। এই তিনটি স্বর ব্যতীত অন্যান্য স্বর সম্পর্কে শ্রীনিবাস ও মঞ্জরীকারের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ নাই।

পণ্ডিত শ্রীনিবাস, মঞ্জরীকার (পঃ ভাতখণ্ডে) ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আন্দোলন সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীনিবাস		মঞ্জরীকার		পাশ্চাত্য পণ্ডিত	
স্বরের নাম	আঃ সংখ্যা	স্বরের নাম	আঃ সংখ্যা	স্বঃ নাঃ	আঃ সংখ্যা
ষড়জ শুদ্ধ	২৪০	ষড়জ শুদ্ধ	২৪০	C	২৪০
ঋষভ কোমল	$২৫৯\frac{১}{৫}$	ঋষভ কোমল	$২৫৪\frac{২}{১৭}$	C"	২৫৬
ঋষভ শুদ্ধ	২৭০	ঋষভ শুদ্ধ	২৭০	D	২৭০
গান্ধার শুদ্ধ	২৮৮	গান্ধার কোমল	২৮৮	D"	২৮৮
গান্ধার তীব্র	$৩০১\frac{১৭}{৪৩}$	গান্ধার শুদ্ধ	$৩০১\frac{১৭}{৪৩}$	E	৩০০
মধ্যম শুদ্ধ	৩২০	মধ্যম শুদ্ধ	৩২০	F	৩২০
মধ্যম তীব্র	$৩৪৪\frac{৮}{১৩}$	মধ্যম তীব্র	$৩৩৮\frac{১৪}{১৭}$	F"	$৩৩৭\frac{১}{২}$
পঞ্চম	৩৬০	পঞ্চম	৩৬০	G	৪৬০
ধৈবত কোমল	$৩৮৮\frac{৪}{৫}$	ধৈবত কোমল	$৩৮১\frac{৩}{১৭}$	G"	৪৮৪
ধৈবত শুদ্ধ	৪০৫	ধৈবত শুদ্ধ	৪০৫	A	৪০০
নিষাদ শুদ্ধ	৪৩২	নিষাদ কোমল	৪৩২	B (flat`	৪৪২
নিষাদ তীব্র	$৪৫২\frac{৪}{৪৩}$	নিষাদ শুদ্ধ	$৪৫২\frac{৪}{৪৩}$	B	৪৫০
তার সা	৪৮০	তার সা	৪৮০	C	৪৮০

২২টী শ্রুতির উপর আধুনিক যুগের ১২টী স্বরস্থান।

শ্রুতির সংখ্যা	শ্রুতির নাম	স্বর	স্বরের আন্দোলন
১	তীব্রা	সা (অচল)	২৪০
২	কুমুদ্বতী	...	...
৩	মন্দা	<u>রে</u> (কোমল)	২৫৪ ২/১৭
৪	ছন্দাবতী	...	...
৫	দয়াবতী	রে (তীব্র)	২৭০
৬	রঞ্জনী	...	...
৭	রক্তিকা	<u>গ</u> (কোমল)	২৮৮
৮	রৌদ্রী	গ (তীব্র)	৩০১ ১৭/৪৩
৯	ক্রোধী	...	...
১০	বজ্রিকা	ম (কোমল বা শুদ্ধ)	৩২০
১১	প্রসারিণী	...	...
১২	প্রীতি	ম॑ (তীব্র)	৩৩৮ ১৪/১৭
১৩	মার্জনী	...	...
১৪	ক্ষিতি	প (অচল)	৩৬০
১৫	রক্তা	...	...
১৬	সন্দিপিনী	<u>ধ</u> (কোমল)	৩৬১ ৩/১৭

শ্রুতির সংখ্যা	শ্রুতির নাম	স্বর	স্বরের আন্দোলন
১৭	আলাপিনী	...	...
১৮	মদন্তী	ধ (তীব্র)	৪০৫
১৯	রোহিণী	...	...
২০	রম্যা	নি (কোমল)	৪৩২
২১	উগ্রা	নি (তীব্র)	৪৫২$\frac{৪}{৪৩}$
২২	ক্ষোভিণী	...	...
১	তীব্রা	সা (তার)	৪৮০

গীত ঃ—মনোরঞ্জনকারী স্বরসমূহকে গীত বলা হয়। উহার দুইটী ভাগ আছে ; যথা গান্ধর্ব্ব ও গান।

গান্ধর্ব্ব ঃ—যে গীত অনাদি সম্প্রদায় অর্থাৎ বেদের সমান অপৌরুষেয় এবং শব্দ প্রধান তাহাকে গান্ধর্ব্ব গীত বলা হইত। স্বর্গ-লোকে গন্ধর্ব্বেরা এই সংগীত গাহিতেন এবং ইহার উদ্দেশ্য ছিল মোক্ষপ্রাপ্তি।

গান ঃ যে সংগীত বাগ্গেয়কার নিজের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সৃষ্টি করিয়া লক্ষণবদ্ধ ভাবে দেশী রাগাদিতে প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহার করিতেন তাহাকে গান বলা হইত এবং ইহার উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনোরঞ্জন করা।

দেশী সংগীত ঃ—গান্ধর্ব্ব ও গানের অন্য দুইটী নাম ছিল—মার্গ ও দেশী। সারঙ্গদেবের সময় পর্য্যন্ত সর্বত্র দেশী সংগীত প্রচলিত ছিল। তৎকালীন দেশী সংগীত বর্ত্তমান কালের হিন্দুস্থানী সংগীত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। দেশী সংগীত বিভিন্ন দেশের লোক-রুচির উপর নির্ভর করে। ইহা নিয়মবদ্ধ নহে। সমাজ ও লোক-রুচির পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে ইহারও পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সংগীত মানব হৃদয়ে সহজেই প্রভাব বিস্তার করে।

নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান ঃ সারঙ্গদেবের সময়ে আধুনিক কালের খেয়াল ও ধ্রুপদের প্রচার ছিল না। সেই সময়ে প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক ইত্যাদি গাওয়া হইত। প্রবন্ধ গানের বিভিন্ন অবয়বকে ধাতু বলা হইত। সঙ্গীত রত্নাকরে উক্ত ধাতু সমূহের নিম্নোক্ত পাঁচটী নাম উল্লিখিত আছে যথা ঃ—(১) উদ্গ্রাহ, (২) ধ্রুব, (৩) মেলাপক, (৪) অন্তরা, (৫) আভোগ। বর্ত্তমানকালের সঙ্গীতে যেমন স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী

ও আভোগ আছে, প্রবন্ধ গানেও উল্লিখিত ধাতু সমূহের ব্যবহার ছিল। বর্ত্তমানে প্রবন্ধ গানের প্রচলন না থাকায় ধাতু সম্পর্কে আলোচনা অনাবশ্যক। রত্নাকরে বহু প্রকার প্রবন্ধের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ গানের গীতরীতি নিবদ্ধ গানের গায়ন পদ্ধতির অন্তর্গত ছিল।

প্রাচীনকালে শাস্ত্রোক্ত, সুনির্দিষ্ট নিয়মে যে গান গাওয়া হইত তাহাকে নিবদ্ধ গান বলা হইত। বিভিন্ন প্রকার তাল এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গীতাবয়বের সীমারেখা দ্বারা ঐ প্রকার গানকে আবদ্ধ করা হইত।

অনিবদ্ধ গান নিবদ্ধ গানের বিপরীত। ইহা তালবদ্ধ নহে এবং গীতাবয়বের নিয়ম সমূহ নিবদ্ধ গানের ন্যায় কঠোরভাবে প্রতিপালিত হইত না। সারঙ্গদেব 'আলপ্তিগান' (বর্ত্তমানে আলাপ) কে অনিবদ্ধ গানের পর্য্যায়ভুক্ত রাখিয়া ছিলেন। আলাপ ও আলপ্তি গানের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও ইহারা অনিবদ্ধ গানেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র।

স্বস্থানঃ- প্রাচীনকালে রাগ বিশেষে বিভিন্ন স্বরের সুনির্দ্দিষ্ট স্থান।

প্রাচীনকালে আলাপের আর একটী সুন্দর নিয়ম ছিল। ইহাকে স্বস্থান নিয়ম বলা হইত। গায়ককে প্রত্যেক আলাপ স্বস্থানের ক্রমানুযায়ী গাহিতে হইত। উহা এইরূপঃ—

বাদী স্বরের উপর সমস্ত রাগ নির্ভর করিত। বাদীস্বরকে স্থায়ী স্বর বলা হইত। বাদী স্বর হইতে চতুর্থ স্বরকে "দ্বয়ার্দ্ধ" স্বর বলা হইত। স্থায়ী স্বর হইতে অষ্টম স্বরকে "দ্বিগুণ" স্বর বলা হইত। দ্বয়ার্দ্ধ ও দ্বিগুণ স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্বর সমূহকে "অর্দ্ধ-স্থিত" স্বর বলা হইত। প্রথম স্বস্থানে গায়ককে সর্বদা নিজের আলাপ দ্বয়ার্দ্ধ স্বরের নীচে রাখিতে হইত। মন্দ্র-সপ্তকে গায়ক ইচ্ছামত আলাপ করিতে পারিত।

রাগালাপ ঃ– প্রাচীনকালে যে গান রাগের গ্রহ, অংশ, মন্দ্র, তার, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব ও ষাড়বত্ব এবং ঔড়বত্ব এই দশটী বিষয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হইত তাহাকে রাগালাপ বলা হইত।

রূপকালাপ ঃ– প্রাচীন আলাপেরই প্রকার ভেদ মাত্র। অতএব রাগালাপের ব্যাখ্যায় যে বিষয় কথা বলা হইয়াছে রূপকালাপেও তাহা অপরিহার্য্য ছিল। কিন্তু ইহাতে একটী মুখ্য বিষয় এই ছিল ; রূপকালাপে গায়ককে প্রবন্ধের ধাতুর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে আলাপ করিতে হইত। এই সকল বিভিন্ন ভাগের সর্বশেষ স্বরটিকে অপন্যাস স্বর বলা হইত। ইহাতে ভাষা এবং তালের অভাব থাকিত। রূপকালাপ রাগালাপ হইতে অধিক বিস্তৃত হইত রূপকালাপকে রাগালাপের পূর্ববর্ত্তী ধাপ বলা যাইতে পারে।

রাগ লক্ষণ ঃ–অর্থাৎ রাগ বিশেষের বৈশিষ্ট্য। ঐগুলি রাগালাপের সাহায্যেই প্রকাশ করা হইত। অতএব "রাগালাপ" ও "রাগ লক্ষণ" এই শব্দ দুইটীর মূলগত উদ্দেশ্য একই।

(১) গ্রহস্বর—যে স্বর হইতে রাগ আরম্ভ করা হইত।

(২) অংশস্বর—যে স্বর রাগে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হইত তাহাকে অংশস্বর, জীবস্বর অথবা বাদীস্বর বলা হইত।

(৩) মন্দ্রস্বর—যে স্বর মন্দ্র সপ্তকে গাওয়া হইত।

(৪) তারস্বর—যে স্বর তারসপ্তকে গাওয়া হইত।

(৫) ন্যাসস্বর—রাগ গাহিবার সময় যে স্বরে বিশ্রাম করা হইত।

(৬) অপন্যাস—রাগ যে স্বরের উপর শেষ করা হইত।

(৭) সন্যাস—যে স্বরের উপর গীতের আদিভাগ শেষ করা হইত।

(৮) বিন্যাস—গীতের প্রথমভাগের প্রথম পংক্তির শেষে যে স্বরটী থাকিত।

(৯) যাড়বত্ব—যে রাগে ছয়টী স্বরের নিয়ম রক্ষা করা হইত।

(১০) ঔড়বত্ব—যে রাগে পাঁচটী স্বরের নিয়ম রক্ষা করা হইত।

অপন্যাস, সন্যাস ও বিন্যাস এইগুলি গীতের বিভিন্ন ভাগের অন্তিম স্বর ছিল। এই ভাগগুলিকে "বিদারী" বলা হইত।

বহুত্বঃ রাগালাপে স্বরের বহুল প্রয়োগ বিধিকে বহুত্ব বলা হইত। স্বরকে দুই প্রকারে বহুত্ব দেওয়া হইত—অলঙ্ঘন ও অভ্যাস দ্বারা। রাগের বাদী ও সম্বাদী স্বর ব্যতীত অন্য অনুবাদী স্বরের বহুল প্রয়োগ করিয়া অলঙ্ঘন দ্বারা উক্ত স্বরটীকে বহুত্ব দেওয়া হইত। যথা—জৌনপুরী রাগে পঞ্চম অথবা মধ্যম। রাগালাপে একই স্বরকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাকে অভ্যাস বলিত। অভ্যাস দুই প্রকারে করা হইত। যথা—

১) একই স্বর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া অথবা

(২) অন্যান্য নিকটবর্তী স্বর সহযোগে উক্ত স্বরটীকে প্রাধান্য দিয়া রাগের বাদী ও সম্বাদী স্বরকে সাধারণতঃ বহুত্ব দেওয়া হইত।

অল্পত্বঃ—রাগালাপে স্বরের অল্প প্রয়োগ বিধিকে অল্পত্ব বলা হইত। স্বরকে দুই প্রকারে অল্পত্ব দেওয়া হইত—লঙ্ঘন ও অনভ্যাস দ্বারা।

লঙ্ঘন অর্থাৎ বর্জ্জন। কোনও রাগে বর্জিত স্বর-সমূহ হইতে কোনও একটী স্বরের অল্প প্রয়োগ হইলে উক্ত বিবাদী স্বরটীকে লঙ্ঘন দ্বারা অল্পত্ব দেওয়া হইত। যথা—ভৈরব রাগে কোমল নিষাদ।

রাগের নিয়মিত স্বর সমূহের মধ্যে যে স্বরগুলি অধিক প্রয়োগ করা যাইত না তাহাকে অনভ্যাস দ্বারা অল্পত্ব দেওয়া হইত। যথা—বেহাগ রাগে ঋষভ ও ধৈবত।

আবির্ভাব-তিরোভাব ঃ—এক মেল হইতে অনেক রাগ উৎপন্ন হইতে পারে। যখন কোন গায়ক গাহিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন স্বর সমুদয়ের সাহায্যে কোন রাগের বিস্তার করিতে থাকেন তখন শ্রোতা-গণের উপরোক্ত রাগে সমপ্রকৃতি অন্য রাগের অংশ শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা থাকে ; কেন না সমপ্রকৃতি রাগের কতকগুলি স্বর একই প্রকার হইয়া থাকে। উহা শ্রবণে শ্রোতাদের মনে ভিন্ন ভিন্ন রাগের ছায়া প্রতিফলিত হয় ; কিন্তু কুশলী গায়ক ঐ সময় উক্ত রাগের বিশেষ অথবা স্বতন্ত্র অঙ্গ যোগ্য-স্থানে রাখিয়া শ্রোতাদের মনের সন্দেহ খুব কুশলতার সহিত দূর করিয়া থাকেন। এইরূপ করিবার সময় রাগের কোন প্রকার হানি হইতে দেন না।

এইরূপ গাহিবার সময় যখন মূল রাগ ক্ষণিকের জন্য অপসারিত অথবা অদৃশ্য হয় তখন উহাকে রাগের তিরোভাব বলা হয় এবং যখন রাগ পুনরায় স্পষ্টভাবে দেখা দেয় তখন তাহাকে রাগের আবির্ভাব বলা হয়।

স্থায় ঃ—ছোট ছোট স্বরবিন্যাস সমূদয়কে "স্থায়" বলা হয়।
যথা— নিসা, রেসা, নিসা ইত্যাদি।

মুখচালনঃ—রাগোপযোগী নানাবিধ গমক, মীড়, অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া গাহিলে অথবা বাজাইলে তাহাকে মুখচালন বলা হইত।

আলপ্তিঃ—আলপ্তি এক প্রকার প্রাচীন আলাপ পদ্ধতি। আলপ্তিতে রাগকে পরিপূর্ণ রীতি অনুসারে করা হইত। ইহাতে রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রদর্শণ করা হইত।

আক্ষিপ্তিকাঃ—তাল, স্বর এবং শব্দ এই তিনটীর সহায়তায় যে গীত রচিত হইত তাহাকে "আক্ষিপ্তিকা" বলা হইত। আক্ষিপ্তিকা (নিবদ্ধগান) যথা—খেয়াল, ধ্রুপদ এবং ধামার ইত্যাদি। প্রত্যেকটী আক্ষিপ্তিকা নিবদ্ধ গানের শ্রেণীতে পড়ে।

বাগ্গেয়কারঃ—প্রাচীনকালে যে সব সংগীত বিদ্গণ পদ্য রচনা এবং স্বর রচনা করিতে পারিতেন তাহাদিগকে বাগ্গেয়কার বলা হইত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপ বিদ্বানকে Composer বলেন। বাগ্গেয়কারের সাহিত্য এবং সংগীত এই দুইটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বাগ্গেয়কার শব্দটির ব্যুৎপত্তি এইরূপ— বাক্+গেয় অর্থাৎ যাঁহার পদ্য রচনায় ও স্বর রচনায় কুশলতা আছে। বাক্ অর্থাৎ পদ্য রচনা এবং গেয় অর্থাৎ স্বর রচনা। ইহাদের অনেকে মাতু এবং ধাতু বলিয়া থাকেন। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে বাগ্গেয়কারের নিম্নলিখিত গুণ থাকা প্রয়োজন।

১। শব্দানুশাসন জ্ঞান—ব্যাকরণ শাস্ত্র জ্ঞান।

২। অভিধান প্রবীণতা—অমর কোষাদি গ্রন্থের জ্ঞান।

৩। ছন্দ প্রভেদ বেদিত্ব—সকল প্রকার ছন্দের জ্ঞান।

৪। অলঙ্কার কৌশল—সংগীত শাস্ত্রে উল্লিখিত অলঙ্কারের জ্ঞান।

৫। রসভাব পরিজ্ঞান—সাহিত্য বর্ণিত শৃঙ্গার রস তথা বিভাবাদি ভাবের উত্তম জ্ঞান।

৬। দেশস্থিত জ্ঞান—বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রীতি ও নীতির জ্ঞান।

৭। অশেষ ভাষা জ্ঞান—বহু প্রকার ভাষার জ্ঞান।

৮। কলাশাস্ত্র কৌশল—সংগীতাদি শাস্ত্রে প্রবীণতা।

৯। তুর্য্য ত্রিতয় চাতুর্য্য—গীত, বাদ্য, ও নৃত্যে পারদর্শিতা।

১০। হৃদ্য শারীর শালিতা—যিনি হৃদ্য অর্থাৎ মনোহর শারীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধিক পরিশ্রম না করিয়া সহজেই যিনি রাগরূপ প্রকাশ করিতে পারেন তাহাকে উত্তম শারীর প্রাপ্ত বলা হইত। "শারীর" একটী পারিভাষিক শব্দ।

১১। লয় তাল কলা জ্ঞান—তাল, লয় ও কলার জ্ঞান।

১২। অনেক কাকু জ্ঞান—ভিন্ন ভিন্ন স্বর ভেদের জ্ঞান। কাকু একটী পারিভাষিক শব্দ। প্রাচীন সংগীতে—
(i) স্বরকাকু, (ii) রাগকাকু, (iii) দেশকাকু, (iv) যন্ত্রকাকু, (v) ক্ষেত্রকাকু, (vi) অন্যরাগকাকু। এই প্রকার ছয়টী কাকুভেদের উল্লেখ আছে। পণ্ডিত কল্লিনাথ "কাকুর্ধ্বনের্বিকারঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৩। প্রভূত প্রতিভোদ্ভেদভাক্তৃত্ব—অপূর্ব্ব প্রতিভাবান ব্যাক্তি।

১৪। সুভগগেয়তা—সুখদায়ক গান করিবার শক্তি।

১৫। দেশীরাগ জ্ঞান—দেশী রাগের জ্ঞান।

১৬। বাক্‌পটুত্ব—সভাতে বিজয়ী হইবার মত বাক্‌পটুতা।

১৭। রাগদ্বেষ পরিত্যাগ—রাগ ও দ্বেষের অভাব।

১৮। সার্দ্রত্ব—সরসতা।

১৯। উচিতজ্ঞতা—কোন্ স্থানে কোন্ জিনিষ যোগ্য হইবে তাহার জ্ঞান।

২০। অনুচ্ছিষ্টোক্তিনির্বন্ধ—স্বতন্ত্র রচনা করিবার ক্ষমতা।

২১। নূত্ন ধাতুবিনির্ম্মিতি জ্ঞান—নূতন নূতন স্বর রচনা করিবার জ্ঞান।

২২। পরচিত্ত পরিজ্ঞান—অন্য লোকের মনের ভাব জানিবার ক্ষমতা।

২৩। প্রবন্ধ প্রগল্‌ভতা—প্রবন্ধের উত্তম জ্ঞান।

২৪। দ্রুত গীতবিনির্মাণ—দ্রুত কবিতা রচনা করিবার ক্ষমতা।

২৫। পদান্তরবিদগ্ধতা—ভিন্ন ভিন্ন গীতের ছায়া অনুকরণ করিবার ক্ষমতা।

২৬। ত্রিস্থানগমক প্রৌঢ়ী—তিন সপ্তকে গমক করিবার ক্ষমতা।

২৭। আলপ্তিনৈপুণ্য—রাগালাপ এবং রূপকালাপের দক্ষতা।

২৮। অবধান—চিত্তের একাগ্রতা।

পণ্ডিত—যিনি সংগীত শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়া কেবল মাত্র সাধারণ ভাবে গাহিতে বা বাজাইতে পারেন তাহাকে পণ্ডিত বলা হয়।

নায়ক—যিনি প্রাচীন ও বর্ত্তমান এই উভয় যুগের সংগীত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং গুরুপরম্পরায় শিক্ষালাভ করিয়া সুর ও তালের বাঁধুনিবদ্ধ সংগীত গাহিতে ও বাজাইতে পারেন তাহাকে নায়ক বলা হয়।

গায়ক—যিনি গুরুপরম্পরায় নায়কী শিক্ষালাভ পূর্বক সংগীতের অন্তর্নিহিত ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গীতকে সুললিত ছন্দ, তান, আলাপ প্রভৃতি বিভিন্ন অলঙ্কারে সুশোভিত করিয়া রসসৃষ্টি দ্বারা লোকচিত্ত বিনোদন করিতে পারেন তাহাকে গায়ক — এবং সেই গাহিবার ভঙ্গীকে গায়কী বলা হয়।

প্রচলিত আলাপ গান ঃ—হিন্দুস্থানী সংগীতে গায়ক আলাপে ত, না, ন, রী, রেণ্তো, নোঁ, নারে, নেনোরি, তনন, নেতোঁ, নানা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র আকারের সাহায্যে না করিয়া উপরোক্ত শব্দ সমূহের প্রয়োগে গান করিলে উহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। সাধারণতঃ গায়কদের রূপকালাপ, আলপ্তি, আক্ষিপ্তিকা প্রভৃতির পার্থক্য অজ্ঞাত থাকে। গুণী গায়কগণ রাগের আবির্ভাব — তিরোভাব দেখাইতে চেষ্টা করেন কিন্তু এইরূপ চেষ্টায় নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখা যায় না। আলাপকালে তাহারা সাধারণতঃ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চারি বিভাগ দেখাইয়া থাকেন। এই বিষয়ে তাহারা পরম্পরাগত সংস্কার মানিয়া চলেন। স্থায়ী অংশ গাহিবার সময় তাহারা এক একটি নূতন স্বর সংযোগে মধ্যসপ্তকের ধৈবত, পঞ্চম, নিষাদ পর্য্যন্ত গাহিয়া থাকেন। তাহার পর তার-ষড়জ ঈষৎ স্পর্শ করিয়া নিম্নস্বরে ফিরিয়া আসিয়া স্থায়ী অংশ সমাপ্ত করেন।

অন্তরা—মধ্যসপ্তকের গান্ধার, মধ্যম অথবা পঞ্চম হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তরার অংশ আরম্ভ হয়। অন্তরা গাহিবার সময় বিবিধ রীতির তান করিয়া তার-ষড়জের উপর উহাদের বিরামের পর ধীরে ধীরে মধ্যসপ্তকের ষড়জে আসিয়া অন্তরার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সঞ্চারী—অন্তরা গাহিবার পর সঞ্চারী অংশ গাওয়া হয়। সঞ্চারী সাধারণতঃ সা মা পা ইহার কোন একটী স্বর হইতে আরম্ভ করা হয়। ইহাতে মীড়, কম্পন ও গমকের প্রয়োগ অধিক দেখা যায়। সঞ্চারী প্রধানতঃ তার স্থান পর্য্যন্ত যায় না। উহা মধ্যসপ্তকের পঞ্চম অথবা মধ্যষড়জে সমাপ্ত করা হয়।

আভোগ—সঞ্চারীর পর স্থায়ী না গাহিয়া একেবারে আভোগ গাওয়া হইয়া থাকে। আভোগে গায়ক তারস্থানের যে কোন স্বরে ইচ্ছা-মত যাইতে পারেন। আভোগের বিস্তার অনেকটা অন্তরার বিস্তারের মত হইয়া থাকে। উত্তমরূপে রাগের বিস্তার সাধারণতঃ মন্দ্র এবং মধ্যস্থানে হইয়া থাকে। অন্তরার বিস্তার তারস্থানেই অধিক হয় এবং উহার স্বর উচ্চস্থানে অবস্থিত বলিয়া শ্রমসাধ্য। এইজন্য অন্তরার আলাপ স্থায়ীর আলাপের তুলনায় অনেক কম হইয়া থাকে। তারস্থানের আলাপ মন্দ্র এবং মধ্যসপ্তকের আলাপেরই পুনরুক্তি। অতএব উক্তস্থানে অধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। পূর্বাঙ্গ-বাদী রাগের আলাপ গায়ক সাধারণতঃ বাদীস্বর হইতে আরম্ভ করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা আরম্ভ করিবার পূর্বে গায়ক সা অথবা ন়িসা স্বরের উপরে উত্তমরূপে আলাপ করিয়া শ্রোতার মন আকর্ষণ করেন। আলাপের প্রথম অংশে ছোট ছোট স্বরসমষ্টি প্রয়োগের পর ষড়জে ফিরিয়া আসেন। ষড়জে ফিরিয়া আসার বিশেষ ধরনের ছোট ছোট তান আছে। এই সব তানে বেশীর ভাগ "তোম্" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। এই প্রকার তান্‌কে "আলাপের সম" বলা হয়।

সুগায়ক প্রথমেই রাগ বিশেষের বিশিষ্ট স্থান নির্ণয় করিয়া তদ্‌-অনুযায়ী আলাপ করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ইমন রাগ গাহিবার সময় গা, পা, নি এবং সা এই স্বরসমূহের উপর অনেক প্রকারের আলাপ করিয়া থাকেন।

উত্তমরূপে আলাপ গাহিতে হইলে গায়কের মধুর কণ্ঠ, রাগজ্ঞান, স্বরজ্ঞান এবং আলাপ গাহিবার বিশিষ্ট রীতির সহিত সম্যক পরিচয় থাকা প্রয়োজন। প্রধানতঃ ধ্রূপদ-গায়কগণ এই প্রকার আলাপ গান করিয়া থাকেন।

হিন্দুস্থানী রাগসংগীতে প্রযোজ্য নিয়মাবলী ঃ—

সারা ভারতে দুই প্রকার সংগীতের প্রচলন আছে। কর্ণাটকী পদ্ধতি (দক্ষিণ ভারতীয়—মাদ্রাজ ও মহীশূর অঞ্চল) ও হিন্দুস্থানী পদ্ধতি (দক্ষিণ ভারত ব্যতীত—সারা ভারতে যে সংগীত প্রচলিত)। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সংগীত আয়ত্ত করিতে হইলে শিক্ষার্থিগণের নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

যথা—

১। হিন্দুস্থানী সংগীতে বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট মানা হয়।

২। সমস্ত রাগগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব জাতি।

৩। কোমল ও শুদ্ধস্বর মিলাইয়া ১২ স্বর হইতে সাধারণতঃ ন্যূনতম ৫ স্বর অথবা ৭ স্বরের অধিক রাগে ব্যবহৃত হয় না।

৪। সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব এই তিন প্রকার জাতির আরোহন ও অব-রোহন পরিবর্ত্তন করিলে নয় প্রকার জাতি উৎপন্ন হয়।

৫। প্রত্যেক রাগে ঠাট, আরোহ—আবরোহ, বাদী—সম্বাদী, সময় ও রঞ্জকতার অবশ্য প্রয়োজন।

৬। বাদী স্বর হইতে সম্বাদীস্বর সাধারণতঃ চতুর্থ বা পঞ্চম স্বরের ব্যবধানে থাকিবে। বাদী পূর্বাঙ্গে থাকিলে সম্বাদী উত্তরাঙ্গে হইবে এবং বাদী উত্তরাঙ্গে থাকিলে সম্বাদী পূর্বাঙ্গে হইবেই।

৭। বাদী স্বর পরিবর্তন করিলে পূর্বাঙ্গের রাগ উত্তরাঙ্গে এবং সেই ভাবেই উত্তরাঙ্গের রাগ পূর্বাঙ্গে গাওয়া যাইতে পারে। যেমন প্রাতঃকালের রাগ দেশকারে ধৈবত বাদী ও গান্ধার সম্বাদী রহিয়াছে এবং ইহার বাদী স্বর পরিবর্তন করিলে সায়ংকালীন ভূপালি রাগে পরিণত হয় যাহার বাদী গান্ধার ও সম্বাদী ধৈবত।

৮। রাগের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিতে হইলে বিবাদী স্বর বা বর্জিত স্বর অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৯। প্রত্যেক রাগের বাদী স্বরটী বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহাতে সেই রাগটী পূর্বাঙ্গ কি উত্তরাঙ্গের এবং উহার গাহিবার সময় বুঝিতে পারা যায়।

১০। এই পদ্ধতির রাগসমূহকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—(১) কোমল <u>রে</u> <u>ধ</u> যুক্ত রাগ, (২) শুদ্ধ রে, ধ যুক্ত রাগ, (৩) কোমল <u>গ</u> <u>নি</u> যুক্ত রাগ। প্রথম বর্গের (সন্ধি প্রকাশ) রাগ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় গাওয়া হয়; তাহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গের রাগ গাওয়া হয়।

১১। যে রাগগুলিতে কোমল <u>গ</u> ও <u>নি</u> ব্যবহৃত হয় সেই রাগসমূহ দ্বিপ্রহরে ও মধ্যরাত্রিতে অধিকতর গাওয়া হইয়া থাকে।

১২। সন্ধি প্রকাশ রাগ গাহিবার পর সাধারণতঃ শুদ্ধ রে গ ধ নি —যুক্ত রাগ গাওয়া হইয়া থাকে।

১৩। দিবা এবং রাত্রির তৃতীয় প্রহরে গেয় রাগসমূহে সা ম প স্বর সমুদয়ের ব্যবহারের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়।

১৪। তীব্র মধ্যমের ব্যবহার রাত্রিতে গেয় রাগে অধিক ও দিবা ভাগের রাগে কম দেখা যায়।

১৫। সা, ম, প এই তিনটী স্বর উভয় অঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সব রাগ দিন বা রাত্রির যে কোন সময় গাওয়া হয়, উপরোক্ত তিনটী স্বরের যে কোন একটী স্বর তাহার বাদীস্বয় হইবে।

১৬। কোন রাগেই ম, প একই সংগে বর্জিত হয় না।

১৭। সা স্বরটী কোন রাগেই বর্জিত হয় না।

১৮। কোন রাগে সাধারণতঃ একই স্বরের কোমল বা তীব্র এই দুই রূপ পর পর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু কতিপয় রাগে ইহার ব্যতিক্রম ও পরিলক্ষিত হয়—যথা ললিত, বসন্ত ইত্যাদি।

১৯। রাগের নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাগ গাহিলে রাগটী অতীব মনোরঞ্জক হয়; কিন্তু রাজ-দরবারে, সংগীত-সম্মিলনীতে বা রঙ্গ-মঞ্চে অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রম ঘটে।

২০। তীব্র মধ্যম ও কোমল নিষাদের ব্যবহার কোন রাগে একই সংগে খুব কম দেখা যায়।

২১। দুই মধ্যম যুক্ত রাগের স্বর-বিন্যাস সাধারণতঃ একই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। আরোহণে পার্থক্য থাকিলেও উক্ত রাগ-সমূহের অন্তরার স্বরবিন্যাস প্রায় একই প্রকারের থাকে।

২২। রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয় দুই মধ্যমযুক্ত রাগে শুদ্ধ মধ্যম আরোহণ এবং অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তীব্র মধ্যম কেবলমাত্র আরোহণেই ব্যবহৃত হয় এবং ইহার ব্যবহার শুদ্ধ মধ্যম অপেক্ষা কম।

২৩। রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয় দুই মধ্যমযুক্ত রাগের আরোহে নিষাদ ও অবরোহে গান্ধার বক্রতা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় এবং অবরোহে নিষাদ দুর্বল থাকে।

২৪। হিন্দুস্থানী সংগীতে তাল অপেক্ষা রাগকে এবং কর্ণাটকী সংগীতে রাগ অপেক্ষা তালকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

২৫। পূর্বাঙ্গ রাগ ও উত্তরাঙ্গ রাগের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য যথাক্রমে আরোহে এবং অবরোহে দৃষ্টি গোচর হয়।

২৬। প্রায় প্রত্যেক ঠাট হইতেই পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ রাগ উৎপন্ন হইতে পারে।

২৭। গম্ভীর প্রকৃতির রাগে সাধারণতঃ সা, ম অথবা প হইতে যে কোন একটী স্বর 'বাদী' হয়। ইহার চলন সাধারণতঃ মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে হইয়া থাকে।

২৮। সন্ধি প্রকাশ রাগে করুণ ও শান্ত রস, শুদ্ধ রে গ ধ যুক্ত রাগে শৃঙ্গার ও হাস্যরস এবং কোমল <u>গ</u> <u>নি</u> যুক্ত রাগে বীর, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রসের আভাষ পাওয়া যায়।

২৯। এক ঠাট হইতে অন্য ঠাটে প্রবেশ করার পূর্ব মূহুর্ত্তে যে রাগটী গাওয়া হয় তাহাকে পরমেল প্রবেশক রাগ বলা হয়।

৩০। যে সব রাগেতে কোমল নিষাদের ব্যবহার আছে সেই সব রাগের আরোহেতে প্রায়ই শুদ্ধ নিষাদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন কাফি ও খাম্বাজ ঠাটের রাগে।

৩১। দুই, তিন বা চার স্বরের দ্বারা তান হইতে পারে কিন্তু রাগ হইতে পারে না।

৩২। দিবা ১২টা ও রাত্রি ১২টার পর যে সব রাগ গাওয়া হয় সেই সব রাগে সা ম প স্বর সমূহের সমধিক ব্যবহার হইতে দেখা যায়।

৩৩। দ্বি-প্রহরের রাগ সমূহে ঋষভ ও নিষাদের ব্যবহার অধিক দেখা যায় এবং অপরাহ্নের রাগের আরোহণে রে ধ দুর্ব্বল তথা প্রায়শঃই বর্জিত হইতে দেখা যায়।

৩৪। প্রাতঃকালের রাগে কোমল রে ধ এর ব্যবহার বেশী দেখা যায় এবং সায়ংকালীন রাগে শুদ্ধ গ ও নি এর ব্যবহার অধিক দেখা যায়।

৩৫। নিসারেগ স্বর বিন্যাস সন্ধি প্রকাশ রাগের নির্দ্দেশক।

পরমেল প্রবেশক রাগ ঃ—পরমেল প্রবেশক কথাটীর অর্থ এই যে এক ঠাট হইতে অন্য ঠাটে প্রবেশ করিবার পূর্বমুহুর্ত্তে যে রাগটী গাওয়া হয় তাহাকে পরমেল প্রবেশক রাগ বলা হয়। ইহার একটী বিশেষ নিয়ম হইতেছে যে উক্ত রাগটীর কতিপয় স্বরবিন্যাস পরবর্ত্তী ঠাটের রাগে দেখা যায় ; যথা—মারোয়া রাগের স্বরবিন্যাস উহার পরবর্ত্তী কল্যাণ ঠাটের ইমন রাগে ব্যবহৃত হয়। আমরা সাধারণতঃ তিনটী পরমেল প্রবেশক রাগ দেখিতে পাই। যেমন সন্ধি প্রকাশ রাগের প্রথম শ্রেণীতে মারোয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীতে জয়জয়ন্তী এবং তৃতীয় শ্রেণীতে মূলতানী।

সমপ্রকৃতি রাগ ঃ—সমপ্রকৃতি রাগ সাধারণতঃ একই ঠাট হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্যবহৃত স্বর সমূহ (তীব্র, শুদ্ধ বা কোমল) ও বাদী, সম্বাদী গাহিবার সময় একই প্রকারের হইতে দেখা যায়, যদিও কখন কখন জাতির পার্থক্য দৃষ্ট হয়; যথা—আশাবরী ও জৌনপুরী। দ্বিতীয়তঃ ঠাট স্বর বাদী ও সম্বাদীর ঐক্য থাকিলেও গাহিবার সময় জাতির পার্থক্য দেখা যায়। যথা—ভীমপলশ্রী ও বাগেশ্রী।

দ্বি-মধ্যম রাগ ঃ—যে রাগে উভয় মধ্যম (শুদ্ধ ম ও তীব্র ম) ব্যবহৃত হয় তাহাকে দ্বিমধ্যম রাগ বলে। ঐ রাগের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহাতে গ ও নি শুদ্ধ হইবে। কল্যাণ ঠাটের দ্বিমধ্যম রাগে তীব্রমধ্যম শুধু আরোহে প্রয়োগ করা হয়। পরন্তু শুদ্ধ মধ্যম আরোহ এবং অবরোহ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হইয়া থাকে। এই প্রয়োগ বিধিরও কদাচিৎ যে ব্যত্তিক্রম দেখা যায় না তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, উপরোক্ত ঠাটের কেদার রাগে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কখন কখন অবরোহীতেও তীব্র মধ্যমের ব্যবহার হইয়া থাকে। কল্যাণ ঠাটের রাগে সাধারণতঃ নিষাদ আরোহে এবং গান্ধার অবরোহে বক্রতা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। পূর্বী ঠাটের রাগেও আরোহ এবং অবরোহীতে তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হয়।

পূর্বী রাগে শুদ্ধ মধ্যম কেবল মাত্র অবরোহীতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরজ ও বসন্ত রাগে আরোহ ও অবরোহীতে উভয় মধ্যমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মারোয়া ঠাটের রাগে উভয় মধ্যম উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

ভৈরব ঠাটের রাগে তীব্র মধ্যম শুধু আরোহণেই ব্যবহার করা হয় এবং শুদ্ধ মধ্যম উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় স্বরের তুলনা

উত্তর ভারতীয় স্বর	দক্ষিণ ভারতীয় স্বর
১। সা (শুদ্ধ)	সা (শুদ্ধ)
২। কোমল রে	শুদ্ধ রে
৩। তীব্র অথবা শুদ্ধ রে	চতুঃশ্রুতি রে অথবা শুদ্ধ গ
৪। কোমল গ	ষট্‌শ্রুতি রে অথবা সাধারণ গ
৫। তীব্র অথবা শুদ্ধ গ	অন্তর গ
৬। শুদ্ধ ম	শুদ্ধ ম
৭। তীব্র ম	প্রতি ম
৮। প (শুদ্ধ)	প (শুদ্ধ)
৯। কোমল ধ	শুদ্ধ ধ.
১০। তীব্র অথবা শুদ্ধ ধ	চতুঃশ্রুতি ধ অথবা শুদ্ধ নি
১১। কোমল নি	ষট্‌শ্রুতি ধ অথবা কৈশিক নি
১২। তীব্র অথবা শুদ্ধ নি	কাকলী নি

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত গ্রন্থ

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
১। রাগ তরঙ্গিনী	লোচন
২। সংগীত পারিজাত	অহোবল
৩। হৃদয় কৌতুকম্	হৃদয়নারায়ণদেব
৪। হৃদয় প্রকাশঃ	”
৫। রাগতত্ব বিবোধঃ	শ্রীনিবাস
৬। সদ্রাগচন্দ্রোদয়	পুণ্ডীক বিট্‌ঠল
৭। রাগ মালা	”
৮। রাগ মঞ্জরী	”
৯। স্বরমেলকলানিধি *	রামামাত্য
১০। চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা *	ব্যঙ্কটমখী
১১। সংগীতসারামৃতম্ *	তুলজেন্দ্র ভোঁসলে
১২। রাগ লক্ষণম *	গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত
১৩। অষ্টোত্তরশততাললক্ষ্মণম্ *	” ” ”
১৪। অনূপবিলাসঃ	ভাবভট্ট
১৫। অনূপাঙ্কুশ	”
১৬। অনূপসংগীত রত্নাকরঃ	”
১৭। রাগবিবোধঃ *	সোমনাথ
১৮। অভিনবরাগমঞ্জরী, ক্রমিক পুস্তক মালিকা, ভাতখণ্ডে সঙ্গীত শাস্ত্র ইত্যাদি	পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে

বিঃ দ্রঃ—তারকাচিহ্নিত গ্রন্থ সমূহ দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের (কর্ণাটকী) প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মানা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

—(০)—

রাগ—শুদ্ধ কল্যাণ

১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে সমস্ত স্বর শুদ্ধ, কেবল মাত্র অবরোহে তীব্র মধ্যম প্রয়োগ করা হয়।

৩। আরোহে মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত।

৪। জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

৫। বাদী—গ
সম্বাদী—ধ } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

৬। আরোহ—সা, রে গ, প ধ সা ।

অবরোহ—সা নি ধ প, ম গ, রে, সা ।

৭। পকড়—গ, রে সা, নি ধ প, সা, গ রে, প রে, সা ।

ইহার সাধারণ প্রকৃতি ভূপালী রাগের মত। এই রাগে মন্দ্রসপ্তকের প্রয়োগ ভূপালী অপেক্ষা অধিক হয়। এই রাগে কখনও কখনও অবরোহণে তীব্র মধ্যমের প্রয়োগ থাকিলেও সুগায়কগণ এই স্বর বর্জিত করিয়া পগ এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবরোহণে নিষাদ স্বরের ব্যবহার প্রবল হওয়ার দরুণ ভূপালী রাগ হইতে এই রাগের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যায়। এই রাগের প এবং রে এর সংমিশ্রণ অতি মাধুর্য্যপূর্ণ। এই রাগের ধৈবত স্বর ভূপালীতে ব্যবহৃত ধৈবত স্বর অপেক্ষা কম প্রয়োগ হওয়া উচিত।

৮। আলাপ :—

গ, রেসা ; সা, রেসা গ, রেগ রে, সারে গরে সা ;

রে, রেসানিধপ, পধপ, সা, সারেগ, রেগ, পগ, রেগরেসা

গরেগ, পমগরেগ, ধপগরে, গপগরে, গরেসা।

সাধপ, গপরে, সা ।

পপগগ, পপধপ সাঁসাঁ, গরেঁসাঁ, সাঁরেঁগ রেঁসাঁ, রেঁরেঁসাঁ,

নিধধ পপ, গগ, পধপরেসা, নিধপ, গপরে, সা ।

রাগ—কামোদ

১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগের সমস্ত স্বর শুদ্ধ এবং দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। শুদ্ধ মধ্যম আরোহে ও অবরোহে এবং তীব্র মধ্যম কেবল মাত্র আরোহে ব্যবহার হইয়া থাকে।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ ।

৪। বাদী—প
সম্বাদী—রে } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

৫। আরোহ—সারে, প, ম॑প, ধপ, নিধর্সা ।

অবরোহ—র্সানিধপ, ম॑পধপ, গমপ, গমরেসা ।

৬। পকড়—রে, প, ম॑প, ধপ, গমপ, গমরেসা ।

৭। রে (মধ্যমকে স্পর্শ করিয়া) হইতে প স্বরে পৌছাইলে এই রাগের রূপ ফুটিয়া উঠে। এই রাগে গ ও নি স্বর হাম্বির, কেদার ও ছায়ানট ইত্যাদি রাগের মত বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়। এই রাগে গান্ধার ও নিষাদ স্বর দুর্বল। অবরোহণে কখনও কখনও কোমল নিষাদ বিবাদী স্বর রূপে ব্যবহৃত হয়।

৮। আলাপ :—

সা, রে^ম^প, পধপ, গমপ, গম, রেসা, রে^ম^প ;

সা, মরেসা, রেসা, ধ়, প়, সা, রেসা, গমপ গমরেসা, রে^ম^প।

প়সা, রেসা, মরেসা, পগমরেসা, ধপ গমপ গমরেসা, রে^ম^পা।

সা^ম^রে, প, প, ম॑প ধপ, নিধপ, র্সানিধপ, ম॑পধম॑প,

গমপ, গমরেসা, রে^ম^পা ।

পপ, র্সা, র্রের্সা, র্মর্রের্সা, র্গর্মর্প র্গর্ম র্রের্সা, র্রের্রের্সা,

ধপ, রে^ম^প, ধপ, র্সাধপ, গমপগমরেসা ।

রাগ–ছায়ানট

১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে সব স্বর শুদ্ধ ও দুই মধ্যম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুদ্ধ মধ্যম আরোহে ও অবরোহে এবং তীব্র মধ্যম কেবল মাত্র আরোহে ব্যবহৃত হয়।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ।

৪। বাদী—প
সম্বাদী—রে } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

৫। আরোহে—সা, রে, গমপ, নিধ, সা̇ ।

অবরোহে—সা̇নিধপ, ম̍পধপ, গমরেসা।

৬। পকড়—প, রে, গমপ, মগ, মরেসা।

৭। এই রাগে প ও রে এই দুই স্বরের সংগতি মাধুর্য্যপূর্ণ। এই রাগে গান্ধার ও নিষাদ স্বরদ্বয় কেদার, কেদার হাম্বীর ও কামোদ ইত্যাদি রাগের ন্যায় বক্রতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অবরোহণে কখনও কখনও কোমল নি̱ এই রাগে বিবাদীস্বর রূপে ব্যবহৃত হয়।

৮। আলাপ ঃ—

ম
সা, রেসা, ধ়প়, সা, রেসা; রে, গ, ম, প, মগমরে,
সারে, সা ।

সাগমরেসা, রেসা, ধনিপ, পসা, রেসা, সারে, রেগা,

গমপ, ম, পগ, মরে, সা ।

পপসা, রেসা, সারেগ, গম; রেসা, সারেসা, ধনিপ,

মপধপ, সা, ধনিপ রেগমধপ, রে, রেগা, গমপ,

মগমরেসা ।

রাগ—গৌড় সারং

১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন ।

২। এই রাগে দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট স্বরসমূহ শুদ্ধ। কল্যাণ ঠাটের হাম্বীর, কেদার ইত্যাদি রাগের ন্যায় এই রাগে গান্ধার ও নিষাদ বক্রতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই রাগে কখনও কখনও কোমল নি রাগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য বিবাদীস্বর রূপে ব্যবহৃত হয়।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ ।

৪। বাদী—গ
সম্বাদী—ধ } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ । সময়—দিবা দ্বিপ্রহর ।

৫। আরোহ—সা, গরেমগা, পমধপ, নিধসা ।

অবরোহ—সাধনিপ, ধমপগ, মরে, প, রেসা ।

৬। পকড়—সা, গরেমগ, পরেসা ।

৭। আলাপ :—

সা, রেসা, গরেমগ, প, মপ, গম, রেগারেমগ, প, রে, সা।

সামগ, রেগরেমগ, প, (প), মগ, নিধনিপ, ধমপ,

গমরেগরেমগ, সাঁ, (প), মগ, মপ সাঁরেঁসাঁ,

(প), মগ, গঁরেঁমঁগঁ, গরেমগ, প, রেসা ।

রাগ–হিন্দোল

১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে রে ও প বর্জিত। মধ্যম তীব্র, বাকী সব স্বর শুদ্ধ।

৩। জাতি—ঔড়ব।

৪। বাদী—ধ
সম্বাদী—গ } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—দিবা প্রথম প্রহর।

৫। আরোহ—সাগ, মধনিধ, সাঁ ।

অবরোহ—সাঁ, নিধ, মগ, সা ।

৬। পকড়—সা, গ, মধনিধমগ, সা ।

৭। এই রাগে নি বক্রভাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার ব্যবহার অল্প হইবে, নি স্বরের বহুল প্রয়োগে "সোহিনী" রাগের ছায়া দেখা যায়। সা ধা এই ভাবে ব্যবহার করিলে "নি" স্বরের অভাব দূর হয়। এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর ।

৮। আলাপ ঃ—

গ, সা, ধ, মধসা, গমগসা, নিধামগ, মগসা।

সাধ, গ, সাধ, মধসা, ধ, মগসা, ধ,

সাগমধ, নিধমগ, সাধ, সাগমধসা,

ধমগমগসা ।

রাগ-শংকরা

১। এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

২। এই রাগে মধ্যম স্বরটী বর্জিত। অবশিষ্ট স্বর সমূহ শুদ্ধ।

৩। জাতি—ষাড়ব ।

৪। বাদী—গ
সম্বাদী—নি } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

৫। আরোহ—সা গ, প, নি ধ র্সা।

অবরোহ—র্সা নি প, নি ধ র্সা নি প, গ প, গ সা।

৬। পকড়—র্সা, নি প, নি ধ, র্সা, নি প, গ প, গ সা।

৭। এই রাগ দুই প্রকারের হয়।

(ক) কেবল মাত্র রে, ম বর্জিত করিয়া গাওয়া হয়।

(খ) কেবল মাত্র ম বর্জিত করিয়া গাওয়া হয়।

এই রাগের সহিত বিহাগ রাগের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

৮। আলাপ :—

সা গ প, গ, সা, গ সা, প্, সা,

গ প গ, সা, নি, প গ, প গ সা।

সা, গ প, নি ধ র্সা, নি, প, গ প, গ, সা।

প গ, প, সা গ, গ প, প্ সা রে সা, গ, গ প, নি প,

র্গ র্রে র্সা, র্রে র্সা, নি ধ র্সা, নি প, গ প, নি র্সা নি প, গ সা।

রাগ—দেশকার

১। এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে ম ও নি বর্জিত। বাকী স্বর শুদ্ধ।

৩। জাতি—ঔড়ব।

৪। বাদী—ধ
সম্বাদী—গ } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—দিবা প্রথম প্রহর।

৫। আরোহ—সা রে গ, প, ধ সা

অবরোহ—সা ধ, প, গ প ধ প, গ রে সা।

৬। পকড়—ধ, প, গ প, গ রে সা।

৭। এই রাগের যোগ্যস্থানে অত্যন্ত নিপুণতার সহিত ধৈবত ব্যবহার করা হয় অন্যথায় ভূপালী রাগের ছায়া আসিবার সম্ভাবনা থাকে।

৮। আলাপ :—

সা, রে সা, গ, রে সা, প গ প, ধ, প,

গ প ধ সা, ধ, প, গ প ধ প, গ রে সা,

সা রে ধ সা, প গ প, ধ প সা, ধ সা, গ রে সা,

রে সা, ধ প, গ প ধ সা, প ধ প, গ প, গ ধ,

প, গ প ধ প, গ রে সা।

রাগ—জয়জয়ন্তী

১। এই রাগ খাম্বাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। জাতি—সম্পূর্ণ ।

৩। বাদী—রে
সম্বাদী—প } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের অন্তিম ভাগ ।

৪। আরোহ—সা, রেরে, রেগরেসা, নিধপ, রে, গমপ, নিসা ।

অবরোহ—সানিধপ, ধম, রেগ রেসা ।

৫। পকড়—রেগরেসা, নিধপ, রে ।

৬। এই রাগে দুই গান্ধার ও দুই নিষাদ (কোমল ও শুদ্ধ) ব্যবহৃত হয়। কোমল গান্ধার সর্বদা “রে গ রে” এই ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা সুরট অঙ্গের রাগ। গৌড়, বিলাবল ও সুরট এই তিন রাগের সংমিশ্রণে জয়জয়ন্তী রাগের উৎপত্তি। এই রাগে “প রে”, এই স্বর সংগতি মাধুর্য্যপূর্ণ। গ সংযোগ থাকায় সংগীত বিদ্বানগণ ইহাকে “পরমেল প্রবেশক রাগ” নামে অভিহিত করেন। সাধারণতঃ এই রাগ গাহিবার পর কাফী ঠাটের রাগ গাওয়া হয়।

৭। আলাপ ঃ—

সা, ধ়নি়রে, রেগরে, গম, রেগরে, রেগমপ, গম, রেগরে,

রেগমপধপ, গম, রেগরে, রেসা, ধ়নি়রে।

সাঁ, ধনিরেঁ, গঁরেঁ, নিধরেঁ, রেঁগঁমঁ, রেঁগঁরেঁসাঁ, মপনিসাঁরেঁ,

নিরেঁ, রেমপসাঁ, নিসাঁরেঁ, রেঁসাঁ, রেঁনিধপ, পরেঁসাঁ,

রেঁনিধপ, গম, রেগরে, নি়সা, রে, রে।

রাগ—রামকেলী

১। এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। জাতি—সম্পূর্ণ।

৩। বাদী—ধ
সম্বাদী—রে } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—প্রাতঃকাল।

৪। আরোহ—সাগ, মপ, ধ, নিসাঁ।

অবরোহ—সাঁনিধ, প, মপধনিধ, পগ, মরেসা।

৫। পকড়—ধ্প, ম॑প, ধ্নিধ্প, গ, ম, র্েসা।

৬। এই রাগ সম্বন্ধে ২।৩ প্রকারের মত আছে।

প্রথমতঃ আরোহতে ম ও নি বর্জিত; যদিও ইহার প্রচার নাই। দ্বিতীয় প্রকার জাতি সম্পূর্ণ মানা হয়। ভৈরব ও রামকেলী এই তুইয়ের পার্থক্যের জন্য ভৈরবের বিস্তার বেশীর ভাগ মন্দ্র ও মধ্যস্থানে এবং রামকেলীর বিস্তার মধ্য ও তারস্থানে হইয়া থাকে। তৃতীয় প্রকারে উভয় মধ্যম এবং উভয় নিষাদ ব্যবহৃত হয়। সুগায়কগণ এই স্বরগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথা—

"ম॑পধ্নিধ্প, গ, মগ, রেসা" এই স্বর সমূদয় রাগে প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। এই রাগের বাদী স্বর সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। তুই মধ্যম ও তুই নিষাদ ব্যবহৃত রাগে পঞ্চমকেও বাদী স্বর মানা যায়। ভৈরব ও রামকেলী রাগে ধৈবত ও ঋষভ আন্দোলিত কিন্তু ভৈরব রাগের ঋষভ অধিকতর আন্দোলিত হয়।

৭। আলাপ ঃ—

সাগ, ম॑পধ, প, গমরেসা, ধ, প, ম॑প, গমপ, গম,
রেসা, পধপ, সা, রেরেসা; গমধপ, সা, রেসানিধপ,
ম॑প ধনিধপ, গমরেসা।

পপধধসা, নিসা, ধ, ধসা, নিসারেসা, নিসা, ধপ, ম,
মপ, পধ সা, ধনিধপ, ম॑প, ম, গম, রে,
গমপ, মরেসা ।

রাগ—বসন্ত

১। এই রাগ পূর্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে দুই মধ্যম, কোমল রে, ধ ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

আরোহে পঞ্চম বর্জিত।

৩। জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ ।

৪। বাদী—তার সা
সম্বাদী—প } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি অন্তিম প্রহর।

৫। আরোহ—সাগ, মধ, রে, সা ।

অবরোহ—রেনিধ, প, মগ, মগ, মধমগ, রেসা ।

৬। পকড়—মধ, রে, সা, রে, নিধপ, মগ, মগ ।

৭। এই রাগের দুই প্রকার গীতরীতি প্রচলিত আছে। প্রথম প্রকারে রাগটীকে সম্পূর্ণ জাতির বলিয়া মানা হয়। দ্বিতীয় প্রকারে দুই মধ্যম ও তীব্র ধ ব্যবহার করিয়া এবং পঞ্চম স্বর বর্জিত করিয়া গাওয়া হইয়া থাকে। এই ভাবে গাহিবার সময় শুদ্ধ মধ্যমকে সম্বাদী মানা হয়। কিন্তু এই রাগ পূর্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন বলিয়া বর্ত্তমানকালে শুদ্ধ ধৈবতের পরিবর্ত্তে কোমল ধৈবত ব্যবহারে গাওয়া হইয়া থাকে এবং তার সা কে বাদী ও পঞ্চমকে সম্বাদী স্বর বলিয়া মানা হয়। বসন্ত ঋতুতে এই রাগ গাওয়া হইয়া থাকে। উত্তরাঙ্গের

প্রাধান্য হেতু তার ষড়জের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়া থাকে। এই রাগে ললিতের অঙ্গ আনন্দদায়ক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। আরোহে পঞ্চম বর্জনের কারণ পরজের ছায়া হইতে বাঁচাইয়া রাখা। ইহার গতি পরজ অপেক্ষা গম্ভীর। মধ, রে, সা, নিধ, প এই স্বর সমন্বয়গুলি বসন্ত রাগের রূপকে স্পষ্ট করে।

এই রাগে "মগ, মগ" ও "সা, নিধ, নিধ" এই স্বর বিন্যাস গুলিও বারংবার গাওয়া হইয়া থাকে।

৮। আলাপ :—

মধসা, নিধপ, মগ, মগ, মগরেসা।

নিসাম, মমগ, মনিমগ, মধসা, রেসা, মগ, মধসা,

রেসা, গরেসা, মগরেসা, নিধ, রেনিধ,

নিধপ, মগ, মধসা।

———

রাগ—পরজ

১। এই রাগ পূর্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে রে ও ধ কোমল, তুই মধ্যম এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ।

৪। বাদী—তারষড়জ, সম্বাদী—পা } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রির অন্তিম প্রহর।

৫। আরোহ—নি সা গ, ম ধ নি সা।

অবরোহ—সা, নি ধ প, ম প ধ প, গ ম গ, ম গ রে সা।

৬। পকড়—সা, নি ধ প, ম প ধ প, গ ম গ।

৭। এই রাগ উত্তরাঙ্গ প্রধান। তারষড়জের প্রাধান্য অতি চমকপ্রদ। এই রাগের গতি চঞ্চল বলিয়া বসন্ত রাগ হইতে ইহার রূপ পৃথক। তান গাহিবার সময় নিযাদ স্বরের উপর সমাপ্তিতে এই রাগের রূপ অধিক স্পষ্ট হয়। সা রে সা রে, নি ধ নি ও ম ধ নি সা নি এই স্বর সমন্বয়গুলি বারংবার প্রয়োগ করিলে রাগের রূপ অধিকতর স্পষ্ট হয়। কাহারো কাহারো মতে আমির খসরু এই রাগ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কলিঙ্গরা ও সুরট রাগের সংমিশ্রণেই রাগটি তৈরী হইয়াছে।

৮। আলাপ ঃ—

নিসা, গ, মগ, মধনি, সা, রেনিসা, সানিধপ, মপধপ, গমগ, মগরেসা। নিসাগ, মগ, ধপ, গমগ, মধনি, ধপ, গমগ, মধনিসারেসা, ধপ, গমগ, রেনিসা, ধপ, গমগ, মগরেসা,। মধনিসানি, ধনি, মধনি, সানিধনি, সারেনিসা, নিধনি, ধপ, গমগ, মধনিসা।

মমগ, মধনিসা, রেসা, সারে, সারে, নিসা, গরেসা, নিনিরেগরেসা, রেনিসা, নিধনি, ধপ, গমগ, মধনিসা।

রাগ-পূরিয়া

১। এই রাগ মারোয়া ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে কোমল রে, তীব্র ম ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

৩। এই রাগে পঞ্চম বর্জিত।

৪। জাতি—ষাড়ব।

৫। বাদী—গ
সম্বাদী—নি } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—সায়ংকাল।

৬। আরোহ—নি রে সা, গ, ম ধ, নি রে সা।

অবরোহ—সা নি, ধ, ম গ, রে সা।

৭। পকড়—গ, নি রে সা, নি ধ নি, ম ধ, রে, সা।

৮। এই রাগ প্রধানতঃ মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে গাওয়া হইয়া থাকে। ইহা সন্ধি প্রকাশ রাগ। নিষাদ ও মধ্যম স্বরের সমন্বয় অত্যন্ত মধুর এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। সা, নি ধ নি, ম গ এই স্বরবিন্যাসগুলি রাগের বৈশিষ্ট্য।

৯। আলাপ ঃ—

গ, নি রে সা, নি ধ নি, ম গ, ম ধ, নি রে সা।

নি রে গ, ম গ, ধ নি রে গ, ম, রে গ, গ ম ধ,

গ ম গ, ম গ রে সা, নি রে, সা।

গ, ম গ, ম ধ নি, ম গ, নি ম গ, ম রে গ, ম গ, নি রে সা।

গ গ, ম ধ সা, নি রে সা, নি রে গ, ম গ রে সা, নি নি ধ নি,

ম গ, ম ধ, নি রে সা।

রাগ-ললিত

১। এই রাগ মারোয়া ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে দুই মধ্যম ও কোমল রে ব্যবহৃত হয়।
অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। এই রাগে পঞ্চম বর্জিত।

৩। জাতি—ষাড়ব।

৪। বাদী—ম
সম্বাদী—সা } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রির অন্তিম প্রহর।

৫। আরোহ—নি রে গ ম, ম ম গ, ম ধ, সা।

অবরোহ—রে নি ধ, ম ধ ম ম গ, রে, সা।

৬। পকড়—নি রে গ ম, ধ ম ধ ম ম, গ।

৭। এই রাগে "ধ ম ধ ম ম" ও "নি রে গ ম, ম ম গ" এই স্বর সমন্বয় গুলি রাগ নির্দ্দেশক। কেহ কেহ এই রাগে কোমল ধৈবত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৮। আলাপ :—

নি রে গ, ম ম গ, ম গ রে গ, রে সা, নি রে গ ম।

ম ম গ, ম ধ ম ম গ, ম গ, রে সা, নি রে গ ম।

নি রে গ, রে গ ম, গ মঁ ধ, মঁ ধ র্সা, নি রেঁ নি, ধ নি ধ,

মঁ ধ মঁ, গ ম গ, মঁ গ রে, গ রে সা, নি রে গ মঁ ধ নি রে নি ধ,

মঁ ধ মঁ ম গ মঁ গ রে সা, নি রে গ ম।

গৌড়—মল্লার

১। বিভিন্ন পণ্ডিতের মতানুসারে এই রাগ খাম্বাজ ও কাফী এই দুই প্রকার ঠাট হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে দুই গান্ধার ও দুই নিষাদ ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ।

৪। বাদী—ম
সম্বাদী—সা } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—দিবা তৃতীয় প্রহর।

৫। (ক) আরোহ—সা রে ম প, ধ র্সা।
অবরোহ—র্সা নি প, ম প গ ম, রে সা। } কাফী ঠাটের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) আরোহ—রে গ রে ম গ রে সা, রে প ম প, ধ র্সা } খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত।
অবরোহ—র্সা ধ নি প ম গ ম রে সা।

৬। পকড়—রে গ রে ম গ রে সা, প ম প ধ র্সা, ধ প ম।

৭। এই রাগ দুই প্রকারে প্রচলিত আছে। খেয়াল গানে শুদ্ধ গান্ধার ও দুই নিষাদ এবং ধ্রুপদ গানে কোমল গান্ধার ও দুই নিষাদ প্রয়োগ করিয়া গাওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন ধ্রুপদে দুই গান্ধার ও দুই নিষাদের ব্যবহার দেখা যায়। এই রাগ সাধারণতঃ বর্ষাঋতুতেই গাওয়া হইয়া থাকে এবং বহুসংখ্যক গানে বর্ষাঋতুর বর্ণনা পাওয়া যায়।

৮। আলাপ :—

সা, রে সা, রে গ ম, প ম, ধ প, ম গ, রে গ, ম, ম গ রে গ ম।

প, ম প, ধ নি প, ধ নি র্সা, ধ নি প, ম প ধ, র্সা রেঁ র্সা,

ধ নি প, ম প র্সা, (প) ম গ, ম রে প, ম গ, রে গ ম।

———

রাগ—মিয়ামল্লার

১। এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে কোমল গ, উভয় নিষাদ ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। ইহার অবরোহে ধৈবত বর্জিত।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ-ষাড়ব।

৪। বাদী—ম
সম্বাদী—সা } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—মধ্যরাত্রি।

৫। আরোহ—রে ম রে সা, ম রে, প, নি ধ, নি র্সা।

অবরোহ—র্সা নি প, ম প, গ ম, রে সা।

৬। পকড়—রে ম রে সা, নি প ম প, নি ধ নি সা, প, গ ম রে সা।

৭। কানাড়া ও মল্লার রাগের মিশ্রণে এই রাগ রচিত। এই রাগে উভয় নিষাদ ব্যবহৃত হয়। কুশলী গায়কেরা উভয় নিষাদ একের পর এক পাশাপাশি ব্যবহার করিয়া রাগ বিকাশে সহায়তা করেন। এই রাগের বিস্তার মন্দ্র ও মধ্যস্থানে অধিক করা হয়। কথিত আছে মিঞা তানসেন এই রাগটি সৃষ্টি করেন। ইহা একটী বর্ষাকালীন রাগ।

৮। আলাপ ঃ—

নি সা, রে সা, নি ধ, নি প, ম প, নি ধ নি সা,

রে, রে প গ, ম রে সা, সা রে সা।

ম প, নি ধ নি সা, রে সা, রে নি সা ধ নি প, ম প,

ধ নি সা, নি প, প গ, গ, ম রে সা।

রাগ বাহার

১। এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। ইহাতে কোমল গান্ধার, দুই নিষাদ ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

আরোহে "রে" এবং অবরোহে "ধ" বর্জিত।

৩। জাতি—ষাড়ব।

৪। বাদী—ম
সম্বাদী—স } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—মধ্যরাত্রি।

৫। আরোহ—নি সা, গ ম, প গ ম, ধ, নি সা।

অবরোহ—সা, নি প ম প, গ ম রে সা।

৬। পকড়—ম প গ ম, ধ, নি সা।

৭। সাধারণতঃ বসন্ত ঋতুতেই এই রাগ গাওয়া হয়। এই রাগে নি প, ম প, গ ম, ধ, নি সা স্বর বিন্যাসগুলি বারংবার গাওয়া হইয়া থাকে। বাহার রাগের সহিত অন্যান্য রাগের সংমিশ্রণে কতকগুলি মিশ্ররাগ উৎপন্ন হইয়াছে; যথা—বসন্ত বাহার, হিন্দোল বাহার, ভৈরব বাহার, মালকোষ বাহার, আড়ানা বাহার ইত্যাদি।

৮। আলাপ ঃ—

সা, ম, ম প, গ, ম, ধ নি সা, সা, নি প, ম প, গ, ম, রেসা।

প, ম প নি প, গ ম ধ, নি প, ধ নি সা, নি প, ধ নি সা,

রে নি সা, গ ম রে সা, নি প, ম প, গ ম রে সা।

রাগ—দরবারী কানাড়া

১। এই রাগ আশাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে গ ধ নি কোমল ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

অবরোহে ধৈবত বর্জিত।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ-ষাড়ব।

৪। বাদী—রে
সম্বাদী—প } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—মধ্যরাত্রি।

৫। আরোহ—নি সা, রে গ রে সা, ম প, ধ, নি, সা।

অবরোহ—সা, ধ, নি, প, ম প, গ, ম রে, সা।

৬। পকড়—গ, রে রে, সা, ধ নি সা, রে, সা।

৭। এই রাগের গান্ধার আন্দোলিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। নি প স্বরসঙ্গতি খুবই মাধুর্য্যপূর্ণ। মিঞা তানসেন এই রাগ সৃষ্টি করেন। এই রাগের বিস্তার মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকেই অধিক হইয়া থাকে এবং এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর। এই রাগের গান্ধার আরোহে দুর্বল এবং দ্রুত তান গাহিবার সময় প্রায়শঃই গান্ধার বর্জিত হইয়া থাকে।

৮। আলাপ ঃ—

স
সা, রে রে, সা, নি সা রে ধ, নি প, ম প ধ নি সা,

ধ নি সা, নি সা, রে, সা

ম প, ধ, নি প, ম ম প, ধ নি প, সা, ধ নি প,

ম ম প, ধ নি প, সা ধ নি প, রে সা, নি রে সা,

সা ধ নি প, প, গ ম রে, রে সা, নি রে সা।

রাগ—আড়ানা

১। এই রাগ আশাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে গ ও ধ কোমল, উভয় নিষাদ এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। আরোহে গান্ধার ও অবরোহে ধৈবত বর্জিত।

৩। জাতি—ষাড়ব।

৪। বাদী—সা
সম্বাদী—প } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

৫। আরোহ—সা রে ম প, ধ, নি সা।

অবরোহ—সা ধ নি প ম প, গ ম রে সা।

৬। পকড়—সা, ধ, নি সা, ধ, নি প ম প, গ ম রে সা।

৭। কতিপয় গ্রন্থকার এই রাগে শুদ্ধ ধৈবত প্রয়োগ করিয়া ইহাকে কাফি ঠাটের রাগ মানিয়া থাকেন। এই রাগের বিস্তার মধ্য ও তার সপ্তকেই অধিক হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে এই রাগ মেঘ ও কানাড়া রাগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

৮। আলাপ :—

সা, ধ, নি প, ম প সা, নি প, ম প, গ, গ ম রে সা,

নি সা রে ম প, ধ, নি রে, সা, নি সা,

নি প, ম প, গ, গ ম রে সা।

ম, প, ম ম, প, ম, নি প, সা নি প, রে সা, নি প, ম ম,

নি প, ধা, নি সা, নি রে সা, সা ধ, নি প, গ ম রে সা

———

রাগ—ঝিঁঝিট

১। এই রাগ খাম্বাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগের নি কোমল এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ।

৪। বাদী—গ
সম্বাদী—নি } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

৫। আরোহ—সা রে গ ম প ধ নি সা।

অবরোহ—সা নি ধ প ম গ রে সা।

৬। পকড়—ধ সা, রে ম, গ, প ম গ রে সা নি ধ প।

৭। এই রাগের বিস্তার সাধারণতঃ মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে গাওয়া হইয়া থাকে। ইহার আরোহে ঋষভ ব্যবহারের দ্বারা ইহাকে খাম্বাজ রাগ হইতে পৃথক রাখা যায়। "ধ সা, রে ম গ," এই স্বর সমুদয় বারংবার গাওয়া হইয়া থাকে এবং ইহাতে রাগের রূপ অধিকতর স্পষ্ট হয়।

৮। আলাপ ঃ—

ধ সা রে ম গ, প ম, ম গ, রে সা, নি ধ প, ধ সা,

রে ম গ, গ ম প ম গ, ধ প ম গ, সা রে গ, সা,

নি ধ প, ধ সা, রে ম গ।

———

রাগ—বিভাষ (ভৈরব ঠাট)

১। এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। ইহাতে রে ও ধ কোমল এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।
ম ও নি বর্জিত।

৩। জাতি—ঔড়ব।

৪। বাদী—ধ
সম্বাদী—গ
(মতান্তরে রে) } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—প্রাতঃকাল।

৫। আরোহ—সা রে গ প, ধ প সাঁ।
অবরোহ—সাঁ ধ প, গ প ধ প, গ রে সা।

৬। পকড়—ধ, প, গ প, গ রে সা।

৭। যে রাগে ম ও নি স্বর বর্জিত থাকে সেই সব রাগের গ ও প স্বর সংগতি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়। এই রাগের প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর।

৮। আলাপ :—

ধ ধ প, গ প ধ প, গ রে সা, সা রে গ, গ প, প, ধ প,
সা রে গ প, ধ ধ প, গ প ধ প, গ রে সা।

ধ ধ, প গ প, ধ ধ সাঁ, সাঁ।

সাঁ রেঁ সাঁ, সাঁ রেঁ, গঁ রেঁ সাঁ, সাঁ রেঁ সাঁ, ধ প, গ প ধ প, গ রে সা।

। রাগ—সিন্ধুরা

১। এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে <u>গ</u> ও <u>নি</u> কোমল। আরোহে <u>গ</u> ও <u>নি</u> বর্জিত।

৩। জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

৪। বাদী—সা
সম্বাদী—প } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—সর্বকালীন রাগ।

৫। আরোহ—সা, রে ম প, ধ, সা̇।

অবরোহ—সা̇, <u>নি</u> ধ প ম <u>গ</u>, রে ম <u>গ</u> রে সা।

৬। পকড়—সা, রে ম প. ধ, সা̇ <u>নি</u> ধ প ম <u>গ</u> রে সা।

৭। এই রাগে নিষাদের ব্যবহার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আরোহে কখনও কখনও নিষাদের প্রয়োগ দেখা যায়।

৮। আলাপ :—

ম <u>গ</u> রে সা, ম প, ধ সা̇, রে̇ <u>গ̇</u> রে̇ সা̇, রে̇ সা̇ <u>নি</u> ধ, ম প,

সা̇ <u>নি</u> ধ, ম প ধ, <u>গ</u> রে, <u>নি</u> ধ সা̇, <u>নি</u> ধ ম প, <u>গ</u> রে, প <u>গ</u> রে,

ম <u>গ</u> রে সা। ম প ধ সা̇, ধ সা̇ রে̇ <u>গ̇</u> রে̇ সা̇, রে̇ সা̇ <u>নি</u> ধ,

ম ম প ধ, সা̇, <u>নি</u> ধ, রে̇ <u>গ̇</u> রে̇ সা̇, <u>নি</u> ধ ম প ধ,

<u>গ</u> রে, ম <u>গ</u> রে সা।

রাগ—তিলং

১। এই রাগ খাম্বাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে উভয় নিষাদ ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। ইহাতে রে ও ধ বর্জিত।

৩। জাতি—ঔড়ব।

৪। বাদী—গ
সম্বাদী—নি } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

৫। আরোহ—সা গ ম প নি সা̇।

অবরোহ—সা̇, নি̲, প, ম গ, সা।

৬। পকড়—নি̣ সা গ ম প, নি সা̇, সা̇ নি̲ প, গ ম গ সা।

৭। এই রাগে নি ও প এর স্বরসংগতি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এই রাগে ধৈবত বর্জিত থাকায় খাম্বাজ রাগের সহিত ইহার পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এই রাগে কখনও কখনও রে অল্প ব্যবহার করা যায়।

৮। আলাপ :—

সা গ, গ ম প, নি̲ প, গ ম গ, প গ ম গ, সা।

গ ম প, গ ম গ, নি̣ সা গ, গ ম প, নি নি সা̇, নি̲ নি̲ প,

গ ম প, নি̲ প, গ ম গ, প গ ম গ, সা।

কতিপয় রাগের তুলনা মূলক আলোচনা

কামোদ — ছায়ানট

— সাদৃশ্য —

(১) উভয় রাগই কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) উভয় রাগেরই জাতি—সম্পূর্ণ।

(৩) উভয় রাগেই শুদ্ধ ম ও তীব্র ম ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

(৪) উভয় রাগেই আরোহে তীব্র ম ব্যবহৃত হয়।

(৫) উভয় রাগেই আরোহে এবং অবরোহে শুদ্ধ ম ব্যবহৃত হয়।

(৬) উভয় রাগেই গ ও নি বক্র।

(৭) উভয় রাগেই কোমল নি বিবাদী স্বর রূপে ব্যবহার করা হয়।

(৮) উভয় রাগেরই গাহিবার সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

— বৈসাদৃশ্য —

কামোদ—

(১) সর্ববাদী সম্মতভাবে বাদী প ও সম্বাদী রে।

(২) এই রাগে প রে সঙ্গতি মীড় সহযোগে গাওয়া হয় না।

(৩) এই রাগে গ ও নি দুর্বল।

ছায়ানাট—

(১) বাদী প ও সম্বাদী রে—মতান্তরে রে ও প।

(২) এই রাগে প রে সঙ্গতি মীড় যুক্ত হওয়ায় রাগের রূপ অধিকতর স্পষ্ট হয়।

(৩) এই রাগে কেবলমাত্র নি দুর্বল।

শংকরা — বেহাগ

— সাদৃশ্য —

(১) উভয় রাগই বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) উভয় রাগেই শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩) উভয় রাগেই বাদী গ ও সম্বাদী নি।

(৪) উভয় রাগেরই গাহিবার সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

(৫) উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী।

(৬) উভয় রাগেই আরোহে রে বর্জিত।

(৭) উভয় রাগেই অবরোহে রে অল্প ব্যবহৃত হয়।

— বৈসাদৃশ্য —

শংকরা—	বেহাগ—
(১) জাতি ষাড়ব—মতান্তরে ঔড়ব।	(১) জাতি ঔড়ব—সম্পূর্ণ।
(২) বাদী গ ও সম্বাদী নি—মতান্তরে সা ও প।	(২) সর্ববাদী সম্মত ভাবে বাদী গ ও সম্বাদী নি।
(৩) গাহিবার সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর—মতান্তরে মধ্যরাত্রি।	(৩) গাহিবার সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
(৪) এই রাগে ম বর্জিত।	(৪) এই রাগে শুদ্ধ ম ব্যবহৃত হয়।
(৫) আরোহে ধ ব্যবহৃত হয়।	(৫) আরোহে ধ বর্জিত।

দেশকার — ভূপালী

— সাদৃশ্য —

(১) উভয় রাগেই শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

(২) উভয় রাগেই ম ও নি বর্জিত।

(৩) উভয় রাগেরই জাতি ঔড়ব—ঔড়ব।

— বৈসাদৃশ্য —

দেশকার—	ভূপালী—
(১) বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন।	(১) কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন।
(২) বাদী ধ ও সম্বাদী গ।	(২) বাদী গ ও সম্বাদী ধ।
(৩) উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।	(৩) পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।
(৪) গাহিবার সময়—দিবা প্রথম প্রহর।	(৪) গাহিবার সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

মূলতানী — তোড়ী

— সাদৃশ্য —

(১) উভয় রাগই তোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) উভয় রাগেই কোমল রে̱, কোমল গ̱, তীব্র ম̍, কোমল ধ̱ এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

— বৈসাদৃশ্য —

মূলতানী—	তোড়ী—
(১) জাতি ঔড়ব—সম্পূর্ণ ।	(১) জাতি—সম্পূর্ণ ।
(২) বাদী প ও সম্বাদী সা ।	(২) বাদী ধ ও সম্বাদী গ ।
(৩) পূর্বাঙ্গবাদী রাগ ।	(৩) উত্তরাঙ্গবাদী রাগ ।
(৪) গাহিবার সময়—দিবা চতুর্থ প্রহর ।	(৪) গাহিবার সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর ।
(৫) এই রাগে আরোহে তীব্র ম স্পর্শ করিয়া কোমল গ গাওয়া হয় ।	(৫) এই রাগে আরোহে কোমল রে স্পর্শ করিয়া কোমল গ গাওয়া হয় ।

পূরিয়া — মারোয়া

— সাদৃশ্য —

(১) উভয় রাগেই মারোয়া ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

(২) উভয় রাগেরই জাতি—ষাড়ব ।

(৩) উভয় রাগেই কোমল রে, তীব্র ম এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ ।

(৪) উভয় রাগই সায়ংকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ ।

(৫) উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী ।

— বৈসাদৃশ্য —

পূরিয়া—	মারোয়া—
(১) বাদী গ ও সম্বাদী নি।	(১) বাদী রে ও সম্বাদী ধ।
(২) এই রাগে মীড় অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাতে রাগের সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।	(২) এই রাগে মীড়ের ব্যবহার অত্যন্ত অল্প ; অধিক ব্যবহারে রাগের রূপ ক্ষুন্ন হয়।
(৩) এই রাগের বিস্তার মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে অধিক হইয়া থাকে।	(৩) এই রাগের বিস্তার মধ্য-সপ্তকে অধিক হইয়া থাকে।
(৪) এই রাগে নি ম সঙ্গতি খুবই সৌন্দর্য্য পূর্ণ—ইহাতে রাগের বৈশিষ্ট্য উত্তমরূপে প্রকাশ পায়।	(৪) এই রাগে ধ ম গ রে এই স্বর-সঙ্গতি রাগের বৈশিষ্ট্য উত্তমরূপে প্রকাশ করে।
(৫) এই রাগে কোন স্বরই বক্র নহে।	(৫) এই রাগে আরোহে নি এবং অবরোহে রে বক্র।

বসন্ত — পরজ

— সাদৃশ্য —

১। উভয় রাগই পূরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগেরই জাতি—সম্পূর্ণ।

৩। উভয় রাগেই কোমল রে, কোমল ধ, শুদ্ধ গ ও নি ব্যবহৃত হয়।

৪। উভয় রাগেই শুদ্ধ ম ও তীব্র ম ব্যবহৃত হয়।

৫। উভয় রাগেই বাদী র্সা এবং সম্বাদী প।

৬। উভয় রাগেরই গাহিবার সময়—রাত্রি চতুর্থ প্রহর।

৭। উভয়ই উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।

৮। উভয় রাগেতেই তার র্সা এর উপর ন্যাস করিয়া রাগের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা হয়।

৯। উভয় রাগই প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

— বৈসাদৃশ্য —

বসন্ত—	পরজ—
(১) জাতি সম্পূর্ণ—মতান্তরে যাড়ব।	(১) জাতি—সম্পূর্ণ।
(২) পূর্বে কেহ কেহ প বর্জিত করিয়া শুদ্ধ ধ ব্যবহার করিতেন।	(২) বর্ত্তমানে সকলেই কোমল ধ̱ ব্যবহার করেন।
(৩) 'গ ম̍ গ' স্বর-সমূহ এই রাগে অধিক ব্যবহৃত হয়।	(৩) 'গ ম গ' স্বর-সমূহ এই রাগে অধিক ব্যবহৃত হয়।
(৪) এই রাগের প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর।	(৪) এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল।
(৫) এই রাগকে 'ঋতু-রাগ' বলা হয়।	(৫) এই রাগ 'ঋতু-রাগ' নহে।

মিয়ামল্লার — বাহার

— সাদৃশ্য —

(১) উভয় রাগই কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) উভয় রাগেই দুই নি (কোমল ও শুদ্ধ), কোমল গ এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

(৩) উভয় রাগেই অবরোহে ধ বর্জিত।

(৪) উভয় রাগেরই গাহিবার সময়—মধ্যরাত্রি।

(৫) উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী।

— বৈসাদৃশ্য —

মিয়ামল্লার—

(১) জাতি সম্পূর্ণ—ষাড়ব।

(২) বাদী ম ও সম্বাদী সা—মতান্তরে সা ও প।

(৩) এই রাগে সমস্ত গায়কই কোমল গ ও শুদ্ধ ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(৪) আরোহে কোনও স্বর বর্জিত হয় না।

(৫) এই রাগের আলাপ মন্দ্রসপ্তকে অধিক হইয়া থাকে।

(৬) এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর।

(৭) এই রাগের বহু গানে বর্ষা ঋতুর বর্ণনা আছে এবং বর্ষা ঋতুতে অধিক গাওয়া হইয়া থাকে।

(৮) বর্ষা ঋতুর যে কোনও সময়ে এই রাগ গাওয়া যাইতে পারে।

বাহার—

(১) জাতি ষাড়ব—ষাড়ব।

(২) সর্ববাদী সম্মতভাবে বাদী ম ও সম্বাদী সা।

(৩) এই রাগে কোনও কোনও খেয়াল গায়ক দ্রুত তান করিবার সময় উভয় গান্ধার ও উভয় ধৈবত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(৪) আরোহে রে বর্জিত।

(৫) এই রাগের আলাপ মধ্যস্থানে অধিক হইয়া থাকে।

(৬) এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল।

(৭) এই রাগের বহু গানে বসন্ত ঋতুর বর্ণনা দেখা যায়।

(৮) বসন্ত ঋতুর যে কোনও সময়ে এই রাগ গাওয়া যাইতে পারে।

দরবারী — আড়ানা

— সাদৃশ্য —

(১) উভয় রাগই আশাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) উভয় রাগেই কোমল গ, ধ, নি এবং শুদ্ধ অবশিষ্ট স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৩) উভয় রাগেই অবরোহে ধ বর্জিত।

(৪) উভয় রাগেই অবরোহে গ বক্র।

(৫) উভয় রাগেই গ দুর্বল।

— বৈসাদৃশ্য —

দরবারী—

(১) জাতি সম্পূর্ণ—ষাড়ব।

(২) গাহিবার সময়—মধ্যরাত্রি।

(৩) বাদী রে ও সম্বাদী প।

(৪) এই রাগ মন্দ্রসপ্তকে অধিক গাওয়া হয় এবং মন্দ্রস্থানে গমকের প্রয়োগ অধিক হইয়া থাকে।

(৫) এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর।

(৬) শুদ্ধ নি কখনও ব্যবহৃত হয় না।

আড়ানা—

(১) জাতি ষাড়ব—ষাড়ব।

(২) গাহিবার সময়—রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

(৩) বাদী সা ও সম্বাদী প।

(৪) এই রাগ মধ্য ও তার সপ্তকে অধিক গাওয়া হয়।

(৫) এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল।

(৬) আরোহে শুদ্ধ নি ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

—ঃ(*)ঃ—

উত্তর ভারতীয় কতিপয় তাল—

কাহারবা—৪ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪
ঠেকা—	ধাগ	ধিন্	নাগ	তিন্
	×		০	

রূপক তাল—৭ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঠেকা—	তিন্	তিন্	না	ধি	না	ধি	না
	×			২		৩	

কাহারবা—৮ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ঠেকা—	ধা	গে	তে	টে	না	গে	ধি	ন্
	×				০			

রুদ্র তাল—১১ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ঠেকা—	ধি	না	ধি	না	তা	তি	না	ক	তা	ধি	না
	×	২	০	৩	৪	৫	০	৬	৭	৮	০

বিক্রম তাল—১২ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ঠেকা—	ধা	S	ধি	ত্তা	S	ক	S	ত্তা
	×		২			০		

৯	১০	১২	১২
তিটে	কতা	গদি	ঘেনে
৩			

গজঝমপা তাল—১৫ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ঠেকা—	ধা	ধিন্	নক্	তক্	ধা	ধিন্	নক্	তক্
	×				২			

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ধিন্	নক্	তক্	কিট্	তক্	গদি	গিন্
০				৩		

সোয়ারী তাল—১৫ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঠেকা—	ধিন্	তেরেকেটে	ধিনা	কৎ	ধিধি	নাধি	ধিনা
	×			২		০	

৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
তিনা	তিনা	তৃক্‌তুনা	কিড়নগ	কত্তা	ধিধি	নাধি	ধিনা
৩		০		৪		০	

শিখর তাল—১৭ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ঠেকা—	ধা	তৃক্	ধিন	নক্	থুং	গা	ধিন্	নক্	ধুম্	কিট্	তক্	ধেৎ
	×						০					

১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ধা	তিট	কত্তা	গদি	ঘেনে
২		৩		

বিষ্ণু তাল—১৭ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঠেকা—	ধিন্	না	ধিন্	ধিনা	না	ধিন্	তৃক্	ধি	না
	×		২			৩			

১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ধিন্	ধিন্	না	ধিন্	ধি	না	ধি	না
৪				০			

লক্ষী তাল—১৮ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঠেকা—	ধিন্	তেৎ	ধেৎ	ধেৎ	দিন্	তা	তিট	কৎ	ধা
	×	২	৩	০	৪	৫	৬	০	৭

১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
দিন্	তা	ধুম	কিট	ধুমা	কিট	কৎ	গদি	ঘেনে
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	০

মত্ত তাল—১৮ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ঠেকা—	ধা	S	ঘি	ড়	ন	ক	ঘি	ড়	ন	ক
	X		০		২		৩		০	

১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
তি	ট	ক	ত্তা	গ	দি	ঘি	ন
৪		৫		৬		০	

ব্রহ্ম তাল—২৮ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ঠেকা—	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	তৃক্	ধিন্	ধিন্	ধা	তি	তি
	X		০		২		৩		০	

১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
না	তি	তি	না	তি	না	তু	না	ক	ত্তা
৪		৫		৬		০		৭	

২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
ধি	না	ধাগে	নেধা	তৃক্	ধি	গদি	ঘেনে
৮		৯		১০		০	

দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতি—

দক্ষিণ পদ্ধতিতে মুখ্য ৭টী তাল আছে। যথা—

(১) ধ্রুব তাল—১৪ মাত্রা। (২) মঠ তাল—১০ মাত্রা।
(৩) রূপক তাল—৬ মাত্রা। (৪) ঝম্প তাল—৭ মাত্রা।
(৫) ত্রিপুট তাল—৮ মাত্রা। (৬) অঠ তাল—১২।
(৭) এক তাল—৪ মাত্রা।

উপরোক্ত প্রত্যেকটী তালের ৫টী করিয়া জাতি আছে; যথা—চতস্রজাতি, তিস্রজাতি, মিশ্রজাতি, খণ্ডজাতি ও সংকীর্ণজাতি।

তালের নাম	চতস্রজাতি	তিস্রজাতি	মিশ্রজাতি	খণ্ডজাতি	সংকীর্ণজাতি
১। ধ্রুব তাল	৪.২.৪.৪	৩.২.৩.৩	৭.২.৭.৭	৫.২.৫.৫	৯.২.৯.৯
২। মঠ তাল	৪.২.৪	৩.২.৩	৭.২.৭	৫.২.৫	৯.২.৯
৩। রূপক তাল	৪.২	৩.২	৭.২	৫.২	৯.২
৪। ঝম্প তাল	৪.১.২	৩.১.২	৭.১ ২	৫.১.২	৯.১.২
৫। ত্রিপুট তাল	৪.২.২	৩.২.২	৭.২.২	৫ ২.২	৯.২.২
৬। অঠ তাল	৪.৪ ২.২	৩.৩.২.২	৭.৭.২.২	৫.৫.২.২	৯.৯.২.২
৭। এক তাল	৪	৩	৭	৫	৯

দক্ষিণ পদ্ধতির তাল লিখিবার সময় ৬ প্রকার চিহ্ন ব্যবহার করা হয় ;

যথা ঃ—

(১) বিরাম	=	‿	=	১ মাত্রা ।
(২) দ্রুত	=	o	=	২ মাত্রা ।
(৩) লঘু	=	I	=	৪ মাত্রা ।
(৪) গুরু	=	S	=	৮ মাত্রা ।
(৫) প্লুত	=	३	=	১২ মাত্রা ।
(৬) কাকপদ	=	+	=	১৬ মাত্রা ।

উপরোক্ত ৬টী চিহ্নের ভিতর লঘুর চিহ্নটী বিশেষ মহত্বপূর্ণ। কারণ জাতি ভেদে লঘুর সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হয়।

চতস্রজাতিতে	লঘুর	সংখ্যা	৪	মাত্রা ।
তিস্রজাতিতে	লঘুর	সংখ্যা	৩	মাত্রা ।
মিশ্রজাতিতে	লঘুর	সংখ্যা	৭	মাত্রা ।
খণ্ডজাতিতে	লঘুর	সংখ্যা	৫	মাত্রা ।
সংকীর্ণজাতিতে	লঘুর	সংখ্যা	৯	মাত্রা ।

নিম্নলিখিত চিহ্ন সমূহের দ্বারা দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিতগণ তাল চিহ্নিত করিয়াছেন।

১।	ধ্রুব তাল—	I0II	=	১৪ মাত্রা।
২।	মঠ তাল—	I0I	=	১০ মাত্রা।
৩।	রূপক তাল—	I0	=	৬ মাত্রা।
৪।	ঝম্প তাল—	I ◡ 0	=	৭ মাত্রা।
৫।	ত্রিপুট তাল—	I00	=	৮ মাত্রা।
৬।	অঠ তাল—	II00	=	১২ মাত্রা।
৭।	এক তাল—	I	=	৪ মাত্রা।

দক্ষিণ পদ্ধতির মূখ্য ৭টী তাল হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে চতস্রজাতিতে লিখিত হইলে নিম্নরূপ হইবে।

(১) ধ্রুব তাল—১৪ মাত্রা (I0II) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১ ২ ৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮ ৯ ১০	১১ ১২ ১৩ ১৪
তাল চিহ্ন—	×	২	৩	৪

(২) মঠ তাল—১০ মাত্রা (I0I) চতস্রজাতি।

মাত্র—	১ ২ ৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮ ৯ ১০
তাল চিহ্ন—	×	২	৩

(৩) রূপক তাল—৬ মাত্রা (I0) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬
তাল চিহ্ন—	×				২	

৪) ঝম্প তাল—৭ মাত্রা (I ⌣ 0) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তাল চিহ্ন—	×				২	৩	

(৫) ত্রিপুট তাল—৮ মাত্রা (I00) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
তাল চিহ্ন—	×				২		৩	

(৬) অঠ তাল—১২ মাত্রা (II00) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
তাল চিহ্ন—	×				২				৩		৪	

এক তাল—৪ মাত্রা (I) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১	২	৩	৪
তাল চিহ্ন—	×			

চতুর্থ অধ্যায়

—ঃ(*)ঃ—

বাংলা-সংগীতের ক্রমবিকাশ

আদিকাল হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত মানবসভ্যতা যেমন সহস্র স্তর ভেদ করিয়া আসিয়াছে সংগীতও তেমনি আর্চিক, গাথিক, সামিক, বৈদিক, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বহু স্তর অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানযুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। যেমন তার বহু প্রদেশ, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি, তেমন সংগীতও তার বহু ও বিচিত্র। বাংলা ভারতেরই একটি প্রদেশ যার মাতৃভাষা বাংলা—ভারতের অন্যতম ভাষা। এই ভাষায় রচিত বাংলার নিজস্ব যে গান, তাহাই "বাংলা গান"। যে কীর্ত্তন সংগীত জগতে কাব্য-রসে ও সুর-সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় তাহা এই বাংলারই সৃষ্টি ও নিজস্ব সম্পদ। এই বাংলার বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি আরো বহু আঞ্চলিক গান নিয়া বাংলার এই সংগীত-ধারা আপন বৈশিষ্ট্যে যে কোন প্রদেশের আঞ্চলিক-সংগীত হইতে সমুজ্জ্বল।

বাংলা গান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তাহার প্রথম সৃষ্টির কাল ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। সংক্ষিপ্তভাবে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

সংগীতধারাকে তিনটি প্রধানযুগে বিভাগক্রমে গ্রহণ করিলে প্রাচীন (বৈদিক), মধ্য ও বর্ত্তমানযুগকেই আমরা বুঝিয়া থাকি। খ্রীষ্টীয় ৯ম হইতে প্রায় ১৫শ শতক পর্য্যন্ত চর্য্যা-পদ, গীত-গোবিন্দ, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও মঙ্গল-গীতিরকাল। এই কালকে "বাংলা গান" সৃষ্টির আদিকাল বলা যায়।

শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির আবির্ভাব কালই "বাংলা গানের" মধ্যযুগ এবং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নিধুবাবু, দাশরথি রায় প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও কাজী নজরুল পর্য্যন্ত যুগকে আধুনিকযুগ বলিয়া ধরা যায়।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে আধুনিকযুগের বাংলা গানই প্রচলিত রহিয়াছে। আদিযুগের চর্য্যা-গান ও মঙ্গল-গীতি আর প্রচলিত নাই এবং লুপ্ত হইয়াছে বলা যায়। কীর্ত্তনগান প্রচলিত থাকিলেও তার পূর্বতনযুগের আদি রূপটির প্রচলন তেমন দেখা যায় না।

এখন এই আধুনিকযুগের বাংলা গানে একটি সীমারেখা টানিয়া কিছু গান পূর্বতন ও কিছু গান সাম্প্রতিক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে এই দুইটি পর্য্যায়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপন করা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্ত্তী রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামনিধি এবং সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সকল গীতিকবির গানকে আধুনিক পর্য্যায়ভুক্ত বলা যায়।

বর্ত্তমানযুগ বাংলাগানের বৈচিত্র্য লইয়া আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই এখানে তাহা আলোচ্য নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা গানের ক্রমবিকাশ কি ভাবে হইল ও বাংলাগান কি পর্য্যায়ে ছিল সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহাই মাত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রাচীন বাংলার সংগীত ও সংস্কৃতি পৌনড্রবর্দ্ধন, বরেন্দ্র ও রাঢ়ভূমি এই তিনটি জনপদ লইয়া গড়িয়া ওঠে। ঐ সময়ে বাংলাদেশ নানা প্রকার সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র রূপে খ্যাত ছিল। বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির আগমনে বাংলার সংস্কৃতি ও সংগীত সমন্বয়ের মহত্ত্বে মাধুর্য্য ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে। বাংলায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্যবসায়, বাণিজ্য ও

পর্য্যটন উপলক্ষে বিদেশীদের গমনাগমন আরো বর্দ্ধিত হইয়া বাংলার সহিত সাংস্কৃতিক আদান প্রদান আরো নিবিড়তর হইয়াছে এবং পক্ষান্তরে বাংলার সংস্কৃতি ও সংগীতকে বহন করিয়া বহু বাঙ্গালী বহু দূর দেশ পর্য্যটন করিয়া বাংলার সহিত বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক যোগ-সূত্র রচনা করিয়াছে। তৎকালে সর্ব-ভারতে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির স্থান খুবই মর্য্যাদাপূর্ণ ছিল।

মৌর্য্যযুগ হইতে গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত বাংলায় সাংস্কৃতিক অনুশীলন সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছে। সর্বযুগেই রাগ-সংগীত ও দেশী সংগীত যেমন পাশাপাশি চলিয়াছে, কথিত যুগেও রাগ-সংগীত ও দেশী সংগীত পাশাপাশি চলিয়াছে। বাংলাদেশের আদিম সভ্যতার সঙ্গে আর্য্য-সভ্যতার যোগাযোগ এই সময়েই বাংলায় স্থিতি লাভ করে ও আর্য্য সংস্কৃতিকে বাংলা আত্মস্থ করিয়া লয়।

এই সময়ে আদিবাসী ও শবরদের দ্বারা "শবরোৎসব", ও অন্যান্য উৎসব নৃত্য-গীতের মাধ্যমে পালিত হইত। রাজারাজড়াদের দরবারে বিশিষ্ট কলাবন্তদের দ্বারা রাগ-সংগীতের চর্চ্চা হইত। আদিবাসীদের কিছু সংগীত এই সময়ে রাগ পর্য্যায়ে উন্নীত হয় ও রাগ-সংগীতের প্রভাবে দেশী সংগীতও ক্রমশঃ সমৃদ্ধতর হইতে আরম্ভ করে।

আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী হইতে দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্য্যা-গীতি, নাথ-গীতি, চাচর ও হোলি প্রভৃতি কতগুলি গীতরীতির প্রচলন বাংলা দেশে ছিল যাহা বর্ত্তমানে প্রচলিত নাই। "চর্য্যাপদ"কেই বাংলা ভাষায় রচিত আদি বা প্রাচীনতম বাংলা গান বলা যায়—যাহা ক্রমবিকাশের পথে বর্ত্তমান যুগে পৌছিয়াছে সমৃদ্ধতর রূপে। জয়দেব রচিত "গীতগোবিন্দ" (জয়দেব পদাবলী মূলতঃ সংস্কৃত-সমুদ্ভব সাহিত্য হইলেও ভাষা, ভাবও ছন্দের দিক হইতে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, সে অনুযায়ী পরবর্ত্তীকালের বাংলা বৈষ্ণবপদাবলী গানের জনক রূপে স্বীকৃত) ও চণ্ডীদাস রচিত

"কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" হওয়ার পর বাংলাগান আরো বিশেষভাবে পরিপুষ্ট ও অধিকতর সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়।

গীতগোবিন্দ ও মঙ্গল-কাব্য সংশ্লিষ্ট গান রাগ-সংগীত হিসাবেই গাওয়া হইত; সেই কারণে রাগ-সংগীতের প্রভাবই সেই যুগে বাংলাগানের উপর বেশী ছিল।

পালযুগে পালরাজাদের কীর্ত্তিগাথা লইয়া অনেক দেশী সংগীত রচিত হয় এবং বহুকাল বাংলাদেশে ঐ গান প্রচলিত ছিল। দেশী-সংগীতও সেই সময় হইতে সমৃদ্ধতর হইতে থাকে।

মধ্যযুগীয় গীতরীতিগুলি সম্বন্ধে এখন সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

চর্য্যাপদ

প্রাচীনযুগে 'পদ' কথাটি সর্বপ্রকার সংগীতেই ব্যবহৃত হইত, এবং গান মাত্রই ছিল 'প্রবন্ধ'। তখন মোট ৩৬টি ধারার প্রবন্ধের প্রচলন ছিল, তার মধ্যে 'চর্য্যাপদ' একটি ধারা তারাবলী শ্রেণীর অন্তর্গত। চর্য্যাপদ সম্বন্ধে বলিতে গেলে স্বভাবতঃই প্রবন্ধের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে, কাজেই ঐ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রবন্ধগীতের শ্রেণী বিভাগ ছিল পাঁচ প্রকার ও বিভিন্ন প্রকারের ৬টি অঙ্গ গীতরীতিরূপে ব্যবহৃত হইত; গাওয়ার পদ্ধতি ছিল ধ্রুপদের ন্যায়।

ঐ ছয়টি অঙ্গ যথা :—

১। স্বর—	অর্থাৎ	(স র গ ম)
২। বিরুদ—	,,	(স্তুতিবাচক ধ্বনি)
৩। পদ—	,,	(কাব্য বা বাণী)
৪। তেনক—	,,	(মঙ্গলবাচক ধ্বনি)
৫। পাট—	,,	(যন্ত্রের বোল্)
৬। তাল—	,,	(লয় সহ গতি)

সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধ ছিল পূর্বে বর্ণিত ঐ মোট ৬টি অঙ্গযুক্ত যাহাকে বলা হইত 'মেদিনী'।

পাঁচ অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধের নাম ছিল 'আনন্দিনী'; চার অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধের নাম ছিল 'দীপনী', তিন অঙ্গযুক্ত 'ভাবনী' ও দুই অঙ্গযুক্ত 'তারাবলী'।

এই 'তারাবলী' শ্রেণীর গানই ছিল 'চর্য্যাপদ'। দুইটি অঙ্গ পদ ও তালবিশিষ্ট। এই গান ছিল অধ্যাত্মবিষয়ক ও বীররসাত্মক। সমবেত ভাবে এই গান গাওয়া হইত ও প্রধান পদটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হইত।

প্রবন্ধগীতের মধ্যে এই গান উচ্চ শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত ছিল না। চর্য্যাগানে রাগের উল্লেখ থাকিলেও সংগীত-শাস্ত্রানুযায়ী তাদের প্রামাণ্য পরিচয় পাওয়া যায় না। চর্য্যাপদ দেশী-সংগীতের পর্য্যায়েই ছিল—এইরূপই অনুমিত হয়।

এই গান মিলিতভাবে গাওয়া হইত এবং কীর্ত্তনগানের সঙ্গে এর কিছুটা সাদৃশ্য ছিল বলিয়া কেউ কেউ অনুমান করেন, কিন্তু কীর্ত্তনগানের সমুন্নতিরকাল আরম্ভ হয় প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচিত হওয়ার পর হইতে।

মঙ্গল-কাব্য

দেবতাগণের আখ্যানভাগ ও পৌরাণিক কাহিনী লইয়া যে সকল মঙ্গলবিধায়ক কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাই মঙ্গল-কাব্য নামে পরিচিত। এই মঙ্গল-কাব্যের যুগ বাংলা দেশে প্রায় চারশত বৎসরব্যাপী ছিল।

মঙ্গল-কাব্য রাগ-সংগীত রূপেই গাওয়া হইত এবং তত, আনদ্ধ, শুষির, ঘন প্রভৃতি সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রই গানে ব্যবহৃত হইত। সেই সময় সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আল্পনা রচনা হইত ও গীত, বাদ্য ও নৃত্যের অনুষ্ঠান হইত। বাদ্যের মধ্যে প্রধান ছিল—বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, কাঁসর, করতাল, ঢাক, ঢোল ও মৃৎভাণ্ড।

বোট্ট, বা কৌশিক-রাগে—নিঃসারু তালে বিলম্বিত লয়ে মঙ্গলাচার গীতি গাওয়া হইত। গীতরূপের তিনটি বিভাগ ছিল। আরম্ভের অংশকে বলা হইত উদগ্রাহ, মাঝের অংশ ধ্রুব ও শেষের অংশ আভোগ। উদগ্রাহ ও ধ্রুব অংশ সম্পূর্ণ গানে আবৃত্তি করা হইত ও আভোগ অংশে কিছু গান ও কিছু পাঠ ছিল।

মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে প্রধান তিনটি ঃ—

(১) মনসামঙ্গল (২) চণ্ডীমঙ্গল (৩) ধর্মমঙ্গল।

পৌরাণিক মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে প্রধান তিনটি ঃ—

(১) ভবানীমঙ্গল (২) সূর্য্যমঙ্গল (৩) অন্নদামঙ্গল।

বৈষ্ণব বিরচিত মানবিক মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে প্রধান দুইটি ঃ—

(১) চৈতন্যভাগবত (২) চৈতন্যমঙ্গল।

মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত কতিপয় বাদ্যযন্ত্র যথা :—

দুন্দুভি, ডিণ্ডিম, মৃদঙ্গ, সানাই, শঙ্খ, করতাল, রবাব, সপ্তস্বরা, মুহরী, ঘণ্টা, শিঙ্গা, ঝাঁঝর, কপিলাস ও খমক ইত্যাদি।

কৃষ্ণলীলা ও কীর্ত্তন

মহাকাব্য 'মহাভারত' রচনার পর মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা করিয়া কৃষ্ণলীলা প্রচার করেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতেই কৃষ্ণলীলা গানের প্রচার আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনের আদি কথা এই—

মঙ্গলকাব্যের যুগে কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন শব্দের উল্লেখ থাকিলেও মধ্য যুগের মত সমবেত ভাবে উচ্চৈঃস্বরে গাওয়ার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচিত হওয়ার পর 'কীর্ত্তন' প্রচার সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ হয় ও ক্রমে ক্রমে সার্থক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রমুখ মহাজনগণ দ্বারা কীর্ত্তনাঙ্গ গানের যথেষ্ট পুষ্টিবিধান হয় ও চৈতন্যযুগে আসিয়া এই গান সর্বশ্রীমণ্ডিত হইয়া সঙ্গীতের সভায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে কিছুকাল কীর্ত্তনের গতি স্তব্ধ থাকিলেও ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা সন্তোষ ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খেতরীতে যে বৈষ্ণব মহাসম্মেলন আহ্বান করেন সেই সময় হইতে পূর্ণ বেগে আবার কীর্ত্তনের প্রচার আরম্ভ হয়। এই কীর্ত্তনকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনবাসী শ্রীজীব গোস্বামী স্বয়ং শ্রীনরোত্তম দাস, শ্রী-শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং শ্রীশ্যামানন্দ এই তিন জন গোস্বামী সন্তানকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া তোলেন এবং দিল্লীর দরবারের শ্রেষ্ঠ সংগীত গুণীদের দ্বারা উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ সংগীত শিক্ষাদান করান।

ধ্রুপদ সংগীত শিক্ষান্তে বিশেষ পারদর্শী হওয়ার পর এই তিনজন গোস্বামী সন্তানই বাংলার বিভিন্ন পরগণায় বসতি স্থাপন করতঃ কীর্ত্তনের প্রচার ও উন্নতি সাধনের ব্রত গ্রহণ করার নির্দেশ প্রাপ্ত হন। শ্রীজীব গোস্বামীর নির্দেশানুযায়ী শ্রীনরোত্তম ঠাকুর গড়েরহাটি পরগণায়, শ্রীনিবাস আচার্য্য মনোহরসাহী পরগণায় ও শ্রীশ্যামানন্দ রাণীহাটি পরগণায় বসতি স্থাপন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্ত্তন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলাদেশে বর্ত্তমানে গরাণহাটি মনোহরসাহী ও রেণেটি নামে কীর্ত্তনের যে তিনটি বিশেষ ধারা বা ঘরানার নাম শোনা যায় পূর্বোল্লিখিত ঐ তিন জন গোস্বামী হইতেই তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে।

"খেতরীর" উৎসবে এই গোস্বামীগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সময় হইতেই আবার কীর্ত্তনের নব-জাগরণের অগ্রগতির সূচনা হয় এবং উহা অদ্যাবধি অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে।

"সঙ্গীত-দর্শিকা" প্রথম ভাগে কীর্ত্তনের গীতরীতি ও ধারা সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা থাকায় এখানে পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই।

এখানে একটু লক্ষ্য করার বিষয় যে, যে তিনজন গোস্বামী এই তিনটি ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁদের তিন জনই উচ্চাঙ্গ রাগ সংগীতের ধারক ছিলেন, এবং তাঁহারা কীর্ত্তনগানে ধ্রুপদের গীত-ভঙ্গিকেই নবতর রূপে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধনা না থাকিলে কীর্ত্তনের এই অনির্বচনীয় রূপটির প্রকাশ হইত না। কীর্ত্তনগান আজও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ গুরুমুখী বিদ্যা রূপেই চলিয়া আসিতেছে।

ইদানীং অপরাপর সংগীতকে যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত করার চেষ্টা চলিতেছে কীর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ এমন কোন চেষ্টা লক্ষিত হয় না। যদি এখন হইতে কীর্ত্তনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্বরলিপি দ্বারা সংরক্ষণের চেষ্টা না

চলে তাহা হইলে ভবিষ্যতে এর প্রকৃত রূপটির বিকৃতি ঘটারই আশঙ্কা অধিক। কীর্ত্তনের অনুশীলনকারী কণ্ঠ-সাধনায় উচ্চস্তরের সাধনসম্পন্ন না হইলে সেই কণ্ঠে কীর্ত্তনের প্রকৃষ্ট রূপটি কিছুতেই ফুটিতে পারেনা।

পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর পূর্বেও উচ্চশ্রেণীর কীর্ত্তনীয়াগণ যে-স্তরের কীর্ত্তনগান পরিবেশন করিতেন এবং শ্রুতির যে বিস্ময়কর প্রয়োগ করিতেন বর্ত্তমানে তেমন কীর্ত্তন বড় আর শোনা যায় না।

কাজেই এখন হইতে দৃঢ়ভাবে কীর্ত্তনের প্রকৃত রূপটিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের চেষ্টা না করিলে কীর্ত্তনের পূর্ব গৌরব অচিরেই ম্লান হইয়া পড়িবে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবেনা।

মধ্যযুগে সাধন-সংগীত ও বাউল-সংগীত

মধ্য-যুগে বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেব ও মধ্য ভারতে নানক, কবীর, তুলসীদাস ও দাদু প্রভৃতি ভক্ত কবিদের আবির্ভাব ঘটে। বাংলায় কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে উক্ত ভক্ত কবিদের সাধন-সংগীতের স্রোতও প্রবাহিত হইতে থাকে। বাংলায়ও তৎকালে নূতন একটি সাধন-সংগীতের ধারা প্রবর্ত্তিত হয়, রাগ ও দেশী-সংগীতের মিশ্রিত রূপ লইয়া এই সময় শিব, শক্তি ও হরি-বিষয়ক বহু সাধন-সংগীত রচিত হয়।

মধ্য-যুগেই বাংলাদেশে নূতন একটি ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় হইার নাম বাউল সম্প্রদায়। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবই এই ধর্মসম্প্রদায়ের উপর ছিল সর্বাধিক।

এই সম্প্রদায় জাতি বিচার মানিত না ও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এই সাধন গ্রহণ করিত। এই সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের বলা হইত বাউল ও মুসলমানদের বলা হইত আওল, দরবেশ, পীর বা ফকির।

বাউলদের গুরুবাদ ধর্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব লইয়া বাংলাদেশে তখন আর একটি নূতন সংগীত ধারার উদ্ভব হয়, যার নাম বাউল-সংগীত; দেশী সুরই যার অবলম্বন। বাংলার সংগীত-সংস্কৃতিতে "বাউল গানের" একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে। কিন্তু মহাজন স্থানীয় যে সব ব্যক্তি বাউল গানের স্রষ্টা ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই দেহ-রক্ষা করিয়াছেন এবং এই সম্প্রদায়ও ক্রমে অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে। সেই কারণেই বাউল গানের অগ্রগতি বা পুষ্টিও এখানে আসিয়াই স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে বলা যায়।

যে সকল তত্ত্বদর্শী গুরুস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয়-সংগীতের মাধ্যমে প্রচার করিতেন, ঐ সম্প্রদায়ে বর্ত্তমানে তেমন কোন "গুরুর" আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া জানা যায়না। কাজেই বাউল গানের চরমবিকাশ ইতিপূর্বেই হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা যায়, এবং এই গানের আর কোন অগ্রগতির আশা নাই মনে করা যায়। বাউল-সংগীতের অনুকরণে হয়ত বহু গান রচিত হইবে বা হইয়াছে কিন্তু যাহারা ঐ ভাবের ভাবুক বা সাধন-সম্পন্ন নন তাঁহাদের রচনা যতই উন্নত শ্রেণীর হউক না কেন সে গান সাধকদের রচনার পর্য্যায় ভুক্ত বলিয়া বিচার করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না।

এই মধ্য-যুগে সাধক-সংগীত ও বাউল-সংগীত ভিন্ন আরো কতকগুলি আঞ্চলিক বা পল্লী-সংগীতের ধারার প্রবর্ত্তন আরম্ভ হয়; শ্রমজীবী কৃষক মাঝিমাল্লা ও আদিবাসী সাঁওতালদের ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি ও ঝুমুর ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের লোক-সংগীত প্রচার লাভ করে। এতদ্ভিন্ন নানা দেব-দেবী বিষয়ক লোক-সংগীত ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে রচিত হইয়া প্রসার লাভ করে। যথা:—গম্ভীরা, ভাদু ইত্যাদি। বিচিত্র রস-সম্ভার লইয়া এই জাতীয় গানের আবির্ভাবে বাংলার আঞ্চলিক-সংগীত এই সময়ে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও রসপুষ্ট হইয়া উঠে।

বিভিন্ন প্রকারের এই সকল আঞ্চলিক-সংগীতের পরিচয় "সংগীত দর্শিকা" প্রথম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। কাজেই এখানে আর অধিক আলোচনা করা হইল না।

পাঁচালী

চৈতন্য-যুগে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে বাংলাদেশে পাঁচালী নামে আর একটি গীতিধারার উদ্ভব হয়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে "পঞ্চ-তালেশ্বর" নামে এক প্রকার গীত বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, যার পাঁচটি পদ পটহ, হুড়ুক্কা, শঙ্খ ও কাঁসি প্রভৃতি বিভিন্ন বাদ্য সহযোগে গাওয়া হইত। প্রথম পদটিতে রাগালাপ করা হইত এবং তাল থাকিত না। এই গান ছিল শৃঙ্গার ও বীর রসাত্মক। এই "পঞ্চতালেশ্বর" অষ্টাদশ শতকের মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায় ও পাঁচালী নাম গ্রহণ পূর্বক নূতন এক গীতরীতি অবলম্বন করে। পাঁচালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কেউ কেউ এই রূপ অভিমত পোষণ করেন।

আবার কেউ বলেন যে কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র রচিত পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি সকলই পাঁচালী নামে অভিহিত। এই গানে "পদ-কর্ত্তার" পদচালনা পূর্বক আসরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বর্ণনীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা ও গান করার রীতি হইতে "পাঁচালী" কথার উদ্ভব হইয়াছে।

ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে—"পঞ্চতালেশ্বরের" নামই মাত্র উল্লেখ আছে দেখা যায়, কিন্তু বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐ গ্রন্থে "পাঁচালীকে" ক্ষুদ্র গীতের পর্য্যায় ভুক্ত করা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্রগীত ছিল চার প্রকার যথা—চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুপদ ও পাঁচালী।

এই "পাঁচালীগান„ দাশরথিরায়ের পূর্ব পয্যন্ত ছড়াগানের আকারে ছিল। কিন্তু দাশরথির কৃতিত্বে এই গানে নূতনভাবে প্রাণ সঞ্চারিত হইলে তাহা রাগসংগীতের স্পর্শে আসিয়া কাব্য সংগীতের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। তিনি পাঁচালীগানে আবার নূতন আবেদন জাগাইয়া তোলেন ও ললিত, বিভাস, সিন্ধুভৈরবী প্রভৃতি রাগে এবং ঝাঁপতালে ও যৎ প্রভৃতি তালে বহু গান রচনা করিয়া সুনিপুনভাবে টপ্পাঙ্গের প্রয়োগে পাঁচালীর অবয়বকে সবিশেষ মাধুর্য্য মণ্ডিত করিয়া তোলেন।

যে অর্থে শ্রীচৈতন্য দেবকে কীর্ত্তনের স্রষ্টা বলা যায় সেই অর্থে "দাশরথিকে" ও "পাঁচালীর" জনক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অপর কেহই পাঁচালী গানে দাশরথি রায়ের সমান কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন না। এক কালে পাঁচালী গানে সারা বাংলাদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল, ও বাংলার সংগীতে ঐ গানের বিশেষ গৌরবময় স্থান ছিল। বর্ত্তমানে পাঁচালী গান প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তাছাড়া ধর্ম্মপ্রাণ শ্রোতার অভাবের কারণে এই জাতীয় সংগীত ক্রমেই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে।

নাচাড়ি

নাচাড়ি পাঁচালীরই "নৃত্য সম্বলিত ভিন্ন একটি রূপ। গায়ক বা ব্যাখ্যা কর্ত্তা ছন্দবিশেষ বর্ণনা কালে নৃত্য দ্বারা প্রকৃত ভাবকে বলিষ্ঠ বা সরস করিয়া তুলিতেন। এই কারণ হইতেই "নাচাড়ি" নামের উদ্ভব হয়। পাঁচালীকার পদ চালনা করিয়া বর্ণনীয় বিষয় ব্যাখ্যা করিলেও নৃত্যের সহিত করিতেন না, কিন্তু নাচাড়িগানে পদ চালনা ও নৃত্য উভয়ই ছিল। পৌরাণিক কাহিনীই ছিল পাঁচালী ও নাচাড়ির একমাত্র অবলম্বন।

দাঁড়াকবি

দাঁড়াকবি পাঁচালীরই আর একটি রূপ এবং পৌরাণিক কাহিনীই তাঁরও অবলম্বন। এই সম্প্রদায়ভূক্ত গায়কগণ একসঙ্গে দাঁড়াইয়া সমবেতভাবে গান করিতেন। এই কারণেই এই সম্প্রদায়ের নাম হয় দাঁড়াকবি। ইহাতে দুইটি পক্ষ মুখোমুখী দাঁড়াইয়া গান করিত ও প্রতি পক্ষে একজন করিয়া "কবিয়াল" থাকিত ও স্বীয়দল পরিচালনা করিত। এই দুইজন কবিয়াল যে কাহিনী অবলম্বনে গান করিত সেই কাহিনীর দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে অবতীর্ণ হইয়া নিজ নিজ চরিত্রকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য তর্ক যুক্তি ও বিচারে এক জন অপর জনকে পরাজিত করিয়া আসরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেন।

ইহারা সাধারণতঃই স্বভাব কবি, সুবক্তা ও সুগায়ক পর্য্যায়ের পণ্ডিত ব্যক্তি হইতেন, এবং তাঁদের দ্বন্দ্ব ও উপস্থিত মত কবিতা গানেই হইত, এই জন্যই তাঁহাদিগকে বলা হইত "কবিয়াল"। এঁরা অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইতেন। অধুনা এই "গান" ও লুপ্ত প্রায়, এবং চর্চা না থাকার ফলে বিশিষ্ট প্রতিভার ও আবির্ভাব আর দেখা যায় না। গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি কবিয়ালগণ বাংলাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বৈঠকী গান

যে সকল পাঁচালীগান রাগের প্রভাবে রচিত হইয়া কাব্য-সংগীতের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল সেই সকল গান ও উচ্চাঙ্গ রাগ-সংগীত উচ্চ স্তরের কলাবন্তদের দ্বারা সংগীতানুরাগীদের বৈঠকঘরে বা মজ্‌লিসে গাওয়া হইত। ইহা হইতেই বৈঠকী গান নামের উৎপত্তি হয়। রাজা মহারাজা ও জমিদার শ্রেণীর সংগীতানুরাগীরাই এই গানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

অধুনা সেই স্তরের শ্রোতারা অধিকাংশই আপন আপন মর্য্যাদা হইতে নানা কারণে বিচ্যুত হইয়া পড়ায় বৈঠকে বা মজলিসে গানের আসর উঠিয়াই গিয়াছে বলা যায়।

ঐ বৈঠকীগানেরই পরবর্ত্তী রূপ হিসাবে উচ্চাঙ্গ-সংগীত হইতে আরম্ভ করিয়া দেশী-সংগীত পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের সংগীত, নৃত্য, ও নানা প্রকারের বাদ্যানুষ্ঠান সংগীত-সম্মেলন বা মিউজিক কন্‌ফারেন্স এ ইদানীং আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। বৈঠকীগান পূর্বে সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত ছিল না। আসর যিনি আহ্বান করিতেন কেবল তাঁহারই নিকট বন্ধু আত্মীয়ের মধ্যে এই অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমানে উপযুক্ত দর্শনীর বিনিময়ে যে কেহই ঐ রূপ কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিতে পারেন। কাজেই কথিত "বৈঠকীগান" লুপ্ত হইলেও বর্ত্তমানে ইহা বরঞ্চ অধিক শ্রীসম্পন্ন হইয়া ভিন্ন একটি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে বলা যায়।

কথকতা

রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রোতারা বর্ত্তমানকালের ন্যায় প্রাচীনকালেও শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন। এই পাঠ ও ব্যাখ্যা করাকে বলা হইত "কথকতা" আর যিনি পাঠ করিতেন তাঁহাকে বলা হইত 'কথক'। রামায়ণ ও মহাভারতেরযুগ হইতেই সম্ভবতঃ কথকতা আরম্ভ হয়।

প্রাচীন যুগে "এই কথকতা" শুধু মাত্র আবৃত্তিতেই নিবদ্ধ ছিল। কাহারও কাহারও মতে এই ধারার প্রথম পরিবর্ত্তন সাধন করেন বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত কথক পণ্ডিত গদাধর শিরোমণি। তিনি লক্ষ্য করিলেন শ্রোতা সাধারণ রামায়ণের কথকতায় যত না আকৃষ্ট হয়, রামায়ণগানে আকৃষ্ট হয় ততোধিক, এই চিন্তাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ভাগবতে প্রথম সুরযোজনা করিয়া "কথকতা" আরম্ভ করেন এবং "কথকতা" এক নূতন রূপ লইয়া তখন আবির্ভূত হইল। শিরোমণি মহাশয় বিশেষ সুকণ্ঠ ও সুবক্তা ছিলেন। "কথকতার" এই নূতন রূপ সারা বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে অধিকতর আকৃষ্ট করিল। শিরোমণি মহাশয় ক্রমে ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র, দক্ষযজ্ঞ, বামনভিক্ষা প্রভৃতি 'ভাগবতের' উৎকৃষ্ট অংশ সমূহে সুর যোজনা করিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন, এবং তৎপ্রবর্ত্তিত সুর ধর্ম্মী ধারাটিই ক্রমে আরো সমৃদ্ধ হইয়া বাংলাদেশে স্থায়ী হয়। "কথকতায়" যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীধর কথক, রামধন শিরোমণি, কৃষ্ণধন শিরোমণি, ধরণী শিরোমণি প্রভৃতি।

যাত্রাগান

"রামায়ণ" শব্দটি "রাম+অয়ন" এই দুইটি শব্দযোগে নিষ্পন্ন। "অয়ন" শব্দের অর্থে "যাত্রা" বোঝায়। সুতরাং রামায়ণ কথাটির অর্থ রামযাত্রা অর্থাৎ রামচরিত্র গাথা বা গান। রামযাত্রা হইতেই নাকি যাত্রাগানের সৃষ্টির সূচনা হয়।

মহর্ষি "বাল্মীকি" রামায়ণ রচনা করেন। পুরাণে উল্লেখ আছে যে লব ও কুশ দ্বারা রামায়ণ গান গীত হইত। রামায়ণের সমগ্র অংশই তখন সুললিত সুরে গীত হইয়া রাম মহিমা প্রচার করিত। পরবর্ত্তী পৌরাণিক কাহিনী ও রামায়ণেরই অনুকরণে গীত হইয়া প্রচারিত হইত। প্রাচীন কালে যাত্রাগানের মৌলিক আকার সংগীতেই নিবদ্ধ ছিল। কালক্রমে ইহাতে বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন অভিনেতার অভিনয় বক্তৃতা ও আরো অন্যান্য আঙ্গিক যুক্ত হইয়া এই যাত্রাগান অধিকতর শ্রীসম্পন্ন হয় এবং এই বাংলাতেই তার পুষ্টি হয় সর্বাধিক।

প্রাচীনকালে "মঙ্গলগীতি" দ্বারা যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইত। মঙ্গলগীতি লুপ্ত হইয়া যাওয়ার পর সেই স্থানে "নটরাজ" বা "বীনাপাণি" বন্দনা গীতি গাহিয়া "যাত্রাভিনয়" আরম্ভ করার রীতি প্রচলিত হয় এবং অদ্যাবধি ও ইহা অব্যাহত রহিয়াছে। অপ্সরী বেশে নৃত্যের সহিত এই গানের অনুষ্ঠান করানো হয় এবং বারো তেরো বৎসরের ছেলেরাই ইহাতে অভিনয় করিয়া দর্শকদের যাত্রাভিনয়ের প্রারম্ভেই আকৃষ্ট করিয়া তোলে।

প্রাচীন কালের "যাত্রাগানের" মৌলিক আকার বাংলাদেশেই বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পশ্চিম প্রদেশে কোন কোন স্থানে অদ্যাবধি প্রাচীন রীতিতেই রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি হইয়া থাকে। "রামযাত্রাতে" দুইটি বালক লব ও কুশের বেশে সাজ্জিত হইয়া যাত্রাভিনয়ের সমস্ত বিষয়ই গানে পরিবেশন করে ও দলের অন্যান্যরা ঐ গানের পুনরাবৃত্তি করে। তেমনি "কৃষ্ণযাত্রায়" শ্রীদাম ও সুবল সাজিয়া বালক দুইটি গাহিয়া যায় ও অন্যান্যরা পুনরাবৃত্তি করে।

ভগবানের অবতার এবং মর্ত্ত্য লোকে তাঁহার লীলা কীর্ত্তন করিয়া জনসাধারণের অন্তরে ধর্মভাব জাগ্রত করাই ছিল যাত্রাগানের মূল উদ্দেশ্য। পুরাকালে বসন্তে দোলযাত্রা, শরতে রাসযাত্রা, ও বর্ষায় রথযাত্রা প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই তিন ঋতুতেই যাত্রা গান হইত। ক্রমে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, শিব

লীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক উপাখ্যান লইয়া "যাত্রা" এত অধিক পুষ্ট হইল যে কেবল মাত্র তিন ঋতুতে তাহা আর সীমাবদ্ধ রহিল না। সকল সময়ে ও সকল ঋতুতেই যাত্রা অনুষ্ঠান চলিতে আরম্ভ করিল। যাত্রাগানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

বাংলাদেশের যাত্রাগায়কদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন পরমানন্দ অধিকারী ও তদীয় শিষ্য বদন ও গোবিন্দ অধিকারী।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোপালউড়ে, মদনমাষ্টার, বৈকুণ্ঠ, লোকা ধোপা, ব্রজরায়, মতিরায়, নীলকণ্ঠ, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি ও বাংলার বিখ্যাত যাত্রাগায়ক ছিলেন।

রবীন্দ্র-সংগীত

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে সংগীত-শিক্ষা ও প্রেরণা

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল বিশুদ্ধ সংগীতের আবহাওয়ায়। তৎকালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে বহু গুণী সংগীতজ্ঞের সমাবেশ হইত। বড়দের লইয়া সেই আসর জমিয়া উঠিত। ছোটরা সেই আসরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইত না। শিশু রবীন্দ্রনাথের সুদূর-পিয়াসী মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত সংগীতের জন্য। বদ্ধ দরজার ভিতর হইতে ভাসিয়া আসিত বিচিত্র রাগ-রাগিণীর সুর-লহরী। অন্তরাল হইতে তিনি শুনিতেন সেকালের শ্রেষ্ঠ গুণীদের গান। এই ভাবেই রাগ-রাগিণীর সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় হইয়াছিল। বড় বড় ওস্তাদদের গান এবং

হিন্দুস্থানী মার্গ-সংগীতের প্রভাব তাঁহার চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন "ছেলেবেলায় যে সব গান আমার শোনা অভ্যাস ছিল সে সখের দলের গান নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা থাট আপনা আপনি জমে উঠেছিল। ছেলেবেলা থেকে ভাল হিন্দুস্থানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ব ও মাধুর্য্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি"। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে রবীন্দ্রনাথ শৈশবে সংগীতে অনুপ্রেরণা কি ভাবে এবং কোথা হইতে পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সংগীত শিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগুরু। ধ্রুপদ ও খেয়ালে সিদ্ধ এই সংগীতগুণীর নিকট রবীন্দ্রনাথ শৈশবে সংগীত চর্চা করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ব্যতীত শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও যদুভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষকদের মধ্যে যদুভট্ট একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যদুভট্ট অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সংগীতজ্ঞ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত। যদুভট্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙ্গালী গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দরোয়ানের মত তাল ঠোকাঠুকি কোর্‌ত না। তাঁর প্রত্যেক গানে একটি Originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা"।

যদুভট্টের বিখ্যাত গান "আজু বহত বসন্ত পবন" গানটির অনুকরণে পরবর্ত্তীকালে তিনি রচনা করিয়াছিলেন "আজি বহিছে বসন্ত পবন" গান খানি।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাকে সংগীতে প্রথম প্রেরণা দিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোতে নিত্যনূতন সুর বাজাইতেন, এবং রবীন্দ্রনাথ সেই সুরগুলিকে কথা দিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। গীত-

রচনা শিক্ষা এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে রাগ-রাগিণীর সহিত নিবিড় পরিচয় হইয়াছিল বলিয়া গীতরচনার ক্ষেত্রে তিনি রাগ-রাগিণী কদাচ অবহেলা করিতে পারেন নাই। সুরযোজনার ক্ষেত্রে রাগ-রাগিণীই ছিল তাঁহার একমাত্র সহায়। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন ভারতীয় সংগীতের বোদ্ধা ব্যক্তি। তিনি তাঁহার সন্তানদের সংগীতে অনুপ্রেরিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর সাংগীতিক আবহাওয়া, পরিবেশ, বিশুদ্ধ রাগ-সংগীত শ্রবণ ও শিক্ষা, প্রখ্যাত সংগীতগুণী ও সংগীত-রসিকদের সাহায্য ও প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে পরবর্ত্তীকালে সার্থক সংগীত-রচয়িতা হইতে সাহায্য করিয়াছে।

রবীন্দ্র-সংগীতের গায়কী—

গায়কী বলিতে সুস্পষ্ট ভাবে কি বুঝায় সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। গাহিবার পদ্ধতিকেই কি গায়কী বলিব? তাহাই যদি হয় তাহা হইলে উত্তম সংগীত পরিবেশনকে (Demonstration) গায়কী বলিতে হয়। অথবা কেহ যদি স্বরলিপি দেখিয়া কোন একটি গান স্বরলিপি অনুযায়ী গাহিতে পারেন তাহা হইলে তাহাকে কি গায়কী বলিব?

ধ্রুবপদ প্রভৃতি বিভিন্ন সংগীতের পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য এবং গায়কী আছে। বৈশিষ্ট্য ও গায়কী এই দুইটি বস্তু পরস্পর খুব নিকট আত্মীয়। রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহার পূর্ণ জ্ঞান আছে গায়কী তাঁহার কণ্ঠে সহজেই আসিবে। কথা ও সুরের মিলন জনিত সৌন্দর্য্যই রবীন্দ্র-সংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অতএব কাব্যরস বোধ থাকা একান্ত প্রয়োজন এবং কাব্যের মূল সুরটি কি তাহাও জানিতে হইবে। গীতালি, গীতাঞ্জলি, খেয়া ও মহুয়া কাব্যের মূল সুরটি না জানা থাকিলে উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থের গানগুলির রস উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। অন্যদিকে সুর· মীড়, মূর্চ্ছনা ও শ্রুতি বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে কাব্য সংগীতে ভাবের সৃষ্টি সম্ভব হয় না। রবীন্দ্র-সংগীতের ধারা, তার

ক্রমবিকাশ, স্বরবৈচিত্র্য, কাব্যবোধ, রাগ-রাগিণীর রূপ এবং বিভিন্ন তাল ও ছন্দের জ্ঞান, এতগুলি বিষয়কে জানিতে হইবে, তাহা হইলে রবীন্দ্র-সংগীতের গায়কী সহজেই কণ্ঠে আসিবে। ইহার জন্য প্রয়োজন সাধনা। অনায়াসলভ্য ইহা নহে। রবীন্দ্র-সংগীতের গায়কী একই প্রকার। বিভিন্ন শিল্পী ভিন্ন ভিন্ন গায়কী দিয়া গান গাহিতে পারেন না। সে স্বাধীনতা তাঁহাদের নাই।

স্বরলিপি গানের কাঠামো, গায়কী তাহাতে করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। কেবল মাত্র স্বরলিপি দেখিয়া রবীন্দ্র-সংগীতের বিচার করিলে ভুল হইবে।

রবীন্দ্রনাথের হিন্দী, আন্তঃপ্রাদেশিক ও পাশ্চাত্য সংগীত ভাঙ্গা কয়েকটী গান

কবি ছিলেন সুন্দরের পূজারী। সুতরাং যেখানে যাহা কিছু সুন্দর তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের হিন্দী ভাঙ্গা বহু গান আছে। কয়েকটীর উল্লেখ করা হইল।

হিন্দী ভাঙ্গা গান :—

মূল গান—	রবীন্দ্রনাথের গান—
বহুর বজাও বংশী	আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা
আজু বহত বসন্ত পবন	আজি বহিছে বসন্ত পবন
জিন ছুঁয়ো মোরে	আঁখিজল মুছাইলে
ইয় জগ ঝুট	আমারে করো জীবন দান
এরিমা সব বন অমুয়া	ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে

প্রাদেশিক সংগীতের সুরের গান :—

মূল গান—	প্রদেশ—	রবীন্দ্রনাথের গান—
নাদ বিদ্যা পরব্রহ্ম	মারাঠি	বিশ্ববীণা রবে
নিতু চরণ মূলে	মাদ্রাজী	বাজে করুণ সুরে
এ হরি সুন্দর	পাঞ্জাবী	এ হরি সুন্দর
বৃন্দাবন লোলা	দক্ষিণী	নীলাঞ্জন ছায়া
সখী বা বা	কানাড়ী	বড় আশা করে

পাশ্চাত্য সংগীতের সুরের গান :—

মূল গান—	রবীন্দ্রনাথের গান—
Nancy Lee	কালী কালী বল্‌রে আজ
Robin Adair	সকলি ফুরালো
Drink to me only	কতবার ভেবেছিনু
Go where glory waits thee	ওহে দয়াময়

তাল ও ছন্দ

রবীন্দ্র-সংগীতে প্রাচীন ও প্রচলিত বহু প্রকার তালের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম জীবনের গানগুলি অধিকাংশই হিন্দুস্থানী মার্গ-সংগীতের অনুকরণে রচিত। সেই জন্যই হিন্দুস্থানী সংগীতে প্রচলিত তালগুলি অতি সহজেই রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

ধামার, চৌতাল, সুরফাঁকতাল, আড়াচৌতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, তেওড়া, ত্রিতাল, মধ্যমান, যৎ, কাহারবা ও দাদ্‌রা তালগুলি বহুলভাবে রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছয়টী তালের সৃষ্টি করেন। যথা :—

১। ঝম্পক = ৫ মাত্রা

ঠেকা—	ধি ধি না	ধি না
	×	২

গান—যেতে যেতে একলা পথে···

২। ষষ্ঠী = ৬ মাত্রা

ঠেকা—	ধা গে	ধা গে তে টে
	×	২

গান—শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে···

৩। রূপকড়া = ৮ মাত্রা

ঠেকা—	ধি ধি না	ধি না	তি তি না
	×	২	৩

গান—গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে···

৪। নবতাল = ৯ মাত্রা

ঠেকা—	ধা দেন্ তা	তেটে কতা	গদি ঘেনে	ধাগে তেটে
	×	২	৩	৪

গান—নিবিড় ঘন আঁধারে···

৫। একাদশী = ১১ মাত্রা

ঠেকা—ধা দেন্ তা	তেটে কতা	গদি ঘেনে	ধাগে তেটে তাগে তেটে
×	২	৩	৪

গান—দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া···

৬। নবপঞ্চতাল = ১৮ মাত্রা

ধা গ	ধা গে	দে ন্তা	তে টে	ধা গে	দে ন্তা
×	২	০	৩	০	৪

গদি ঘেনে	ধাগে তেটে	তাগে তেটে
০	৫	০

গান—জননী তোমার করুণ চরণ খানি···

———

"সংগীতের মুক্তি" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চল্‌বে…" অন্যত্র আবার বলিয়াছেন, "কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়"।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দগুরু সেই জন্য তাঁহার সংগীতেও অপূর্ব ছন্দবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। কথা ও সুরের মিলন রবীন্দ্র-সংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য আবার কথা ও সুরের সহিত তাল ও ছন্দের মিলনও রবীন্দ্র-সংগীতের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সংগীতে কাব্যের ভাব প্রকাশে সহায়তা করে এই ভাবেই তালেরও প্রয়োগ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বড় কবিতাগুলিতে সুর-সংযোজনা ও ছন্দ লক্ষ্য করার বিষয়। এই প্রকার গানে monotony কাটাইবার জন্য তিনি বিভিন্ন স্তবকে কাব্যের ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার তালের প্রয়োগ করিয়াছেন। "হে নিরুপমা", "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে", "বিশ্ববীণা রবে" "নৃত্যের তালে তালে" গানগুলি ছন্দ বৈচিত্র্যের অপূর্ব নিদর্শণ। "কৃষ্ণকলি" গানটি তাল বদ্ধ নহে, কথা বলিবার ছন্দে এই গানটি গীত হইয়া থাকে। গভীর রসবোধ ও ছন্দবোধ না থাকিলে গানটি গাওয়া অতিশয় কঠিন। গীতি-নাট্যে ও নৃত্য-নাট্যে পাত্র-পাত্রীর চরিত্রগত ভাব অনুযায়ী গানে তালের প্রয়োগ আছে। "শ্যামা" নৃত্য-নাট্যে কোটালের গানগুলি লক্ষ্য করিলে উদ্ধত ও কঠোর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন কোটাল শ্যামাকে বলিতেছে—"চুপ কর! দূরে যাও নারী; বাধা দিও না, বাধা দিও না"। একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে বিভিন্ন ছন্দ বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। রবীন্দ্র-সংগীতে আমরা গানের ভাব ও মেজাজ অনুযায়ী তাল ও ছন্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে" গানটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত গানটি তুই প্রকার ছন্দে গীত হইয়া থাকে। একটি কাহারবা এবং অন্যটি ষষ্ঠী। কাহারবা তালের প্রয়োগে গানটির মধ্যে উচ্ছলতাই প্রকাশ

পায় এবং ষষ্ঠী তালে ঐ একই গানের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যে গান উচ্ছলতা প্রকাশ করিল কাহারবা তালে, সেই গানেই আবার উদাস ভাব আনিয়া দিল ষষ্ঠী তাল। মূল কথা হইল রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংগীতে গানের অন্তর্নিহিত ভাবটি যাহাতে ব্যাহত না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাল ও ছন্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্র-সংগীতে ধ্রুপদ ও টপ্পা-গানের প্রভাব

"হিন্দু-সংগীতে মূলত যে পাঁচটী ভাগ আছে রবীন্দ্রনাথও সেই পাঁচটী ভাগে বহুসংখ্যক গান রচনা করিয়াছেন। সেই পাঁচটী ভাগ হইল, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুগে ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা ইত্যাদির অনুকরণে শাস্ত্রসম্মতভাবে বহুগান রচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র নাথ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন ধ্রুপদ, ধামার ও টপ্পার প্রচলনই ছিল অধিক। খেয়াল ও ঠুংরী এত উৎকর্ষ লাভ করে নাই। রবীন্দ্র নাথের জীবন ব্যাপী সংগীত রচনায় ধ্রুপদ ও টপ্পার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ঋতু-সংগীত, কাব্য-সংগীতেও ধ্রুপদ ও টপ্পার অলঙ্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্রুপদের বৈশিষ্ট্য হইল সুরের স্থিতি ও সংযম। রবীন্দ্র-সংগীতেও এই বৈশিষ্ট্যটুকু বিদ্যমান। মীড়, গমক, ছোট টপ্পার দানা রবীন্দ্র-সংগীতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। হিন্দুস্থানী টপ্পার অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন—যথা ঃ—"এ পরবাসে রবে কে", "এ কি করুণাময়" ইত্যাদি। আবার "সার্থকজনম আমার", "কোথা যে উধাও হোল" ইত্যাদি গানগুলিতেও টপ্পার অলঙ্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে কীর্ত্তনাঙ্গ গানেও টপ্পার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই", "তোমায় নতুন ক'রেই পাব বলে" ইত্যাদি। ধ্রুপদের মীড়, গমক এবং টপ্পার অলঙ্করণ সমগ্রভাবে রবীন্দ্র-সংগীতের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। উপরোক্ত গানগুলি কেবল স্বরলিপির সাহায্যেই গাওয়া যায় না। ইহার গায়কী বিশেষজ্ঞের নিকট শুনিয়া শিখিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী হিন্দী ভাংগা ধ্রুপদ ও টপ্পা

ধ্রুপদ –

মূল গান—	রাগ ও তাল—		রবীন্দ্র-সংগীত—
আজু বহ সুগন্ধ পবন	পূর্বী,	তেওড়া	আজি বহিছে বসন্ত পবন
জয় প্রবল বেগবতী	বৃন্দাবনী সারং,	„	জয় তব বিচিত্র আনন্দ
জগজন ধ্যান করত	বড়হংস সারং,	চৌতাল	তাঁহারে আরতি করে
বেণী নিরখত ভুঞ্জ	আড়ানা,	„	বাণী তব ধায়
আয়ো ফাগুন বঢ়োমান	নায়কী কানাড়া,	ধামার	সুধা সাগর তীরে (ধামার)

টপ্পা—

মূল গান—	রাগ ও তাল—		রবীন্দ্র-সংগীত—
ও মিঞা বেজন্নুওয়ালে	সিন্ধু,	মধ্যমান	এ পরবাসে রবে কে
বে পরিয়া তাঁড়ে	„	„	কে বসিলে আজি
মিঞা বে মান্নুডে	ঝিঁঝিট,	„	হৃদয় বাসনা পূর্ণ হোল

———

বিষয় বৈচিত্র্য

রবীন্দ্র-সংগীতে বিষয় বৈচিত্র্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এরূপ বৈচিত্র্য সন্তার পূর্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন কবির নিকট হইতে আমরা পাই নাই। কেহ হয়ত হাসির গান রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, কেহ প্রেমের গান লিখিয়া খ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু একাধারে বিভিন্ন বিষয়ে সংগীত রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথই সফল হইয়াছেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। মানব মনের বিভিন্ন অনুভূতির গান আমরা তাঁহার রচনার মধ্যে পাই। ইহা ছাড়া স্বদেশী গান, ধর্ম-সংগীত, শিশু-সংগীত, আনুষ্ঠানিক গান, ঋতু-সংগীত ও হাসির গান ইত্যাদি তাঁহার গীতরচনাকে সমৃদ্ধি দান করিয়াছে। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে শোকে, দুঃখে, আনন্দে ও উৎসবে রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের নিত্য সংগী। রবীন্দ্রনাথ প্রায় আড়াই হাজার গান লিখিয়াছেন। তাঁহার এই বিপুল সংগীত রচনার মধ্যে আমরা আমাদের প্রয়োজন মত গান বাছিয়া লইতে পারি। তিনি গাহিয়াছেন বিশ্ব-প্রকৃতির গান, বিশ্ব-পতির গান ও বিশ্ব-মানবের গান। তাঁহার রচনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে তাঁহার সংগীতের ভাবধারায় কোন বিশেষ ধর্মের বা বিশেষ সম্প্রদায়ের স্থান নাই। সেই জন্য সকল মানুষের মধ্যেই তাঁহার গান স্থান লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-সংগীতের পাঁচটী পর্য্যায় ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহার রচিত সংগীতকে 'পূজা' 'প্রেম' 'প্রকৃতি' প্রভৃতি বহু বিষয়বিন্যাসে ভাগ করিয়াছেন। গানের দৃষ্টান্ত সহ বিভাগটী এইরূপ—

পূজা—

গান··· ··· কান্নাহাসির-দোল-দোলানো—

বন্ধু··· ··· তোমায় আমায় মিলন হবে বলে—

প্রার্থনা··· ··· আমার মিলন লাগি তুমি—

বিরহ··· ··· পথ চেয়ে যে কেটে গেল—

সাধনা ও সংকল্প···	···	নিবিড় ঘন আঁধারে—
দুঃখ···	···	এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার—
আশ্বাস···	···	আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু—
অন্তর্মুখে···	···	চোখের আলোয় দেখেছিলাম—
আত্মবোধন···	···	শান্ত হ'রে মম চিত্ত—
জাগরণ···	···	শুভ্র নব শঙ্খ—
নিঃসংশয়···	···	ওদের কথায় ধাঁদা লাগে—
সাধক···	···	জানি হে যবে প্রভাত হবে—
উৎসব···	···	কী গাব আমি, কী শুনাব—
আনন্দ···	···	আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি—
বিশ্ব···	···	মহাবিশ্বে মহাকাশে—
বিবিধ···	···	জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি—
সুন্দর···	···	মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ···
বাউল ··	···	আমার প্রাণের মানুষ—
পথ···	···	আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ—
শেষ···	···	যা পেয়েছি প্রথম দিনে—
পরিণয়···	···	যে তরণীখানি ভাসালে দু'জনে—
স্বদেশ···	···	যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—

প্রেম—

গান···	···	কাল রাতের বেলা গান এল—
প্রেম বৈচিত্র্য···		হে নিরুপমা— বর্ষণ মন্দ্রিত অন্ধকারে— একদিন চিনে নেবে তারে— চৈত্র পবনে মম চিত্ত বনে—

প্রকৃতি—

সাধারণ···	···	বিশ্ববীণা রবে—
গ্রীষ্ম···	···	প্রখর তপন তাপে—
বর্ষা ··	···	ঐ আসে ঐ অতি—
শরৎ···	···	আমার নয়ন ভুলানো এলে—
হেমন্ত···	···	হেমন্তে কোন্ বসন্তেরি বাণী—
শীত···	···	এল যে শীতের বেলা—
বসন্ত···	···	আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—
বিচিত্র···	···	যখন পড়বে না মোর—
আনুষ্ঠানিক···	···	সবারে করি আহ্বান—
পরিশিষ্ট···	···	প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে—

———

রবীন্দ্র-সংগীতে মিশ্রণ

প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় সংগীতে বহু নূতন রাগ-রাগিণী স্থষ্টি হইয়াছে। এক রাগের সহিত অন্য একটি রাগের মিশ্রণ বা এক রাগের সহিত তুই বা ততোধিক রাগের মিশ্রণে নূতন স্থষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে। এই ভাবে ভারতীয় সংগীতে নূতন রাগ-রাগিণী স্থষ্টি হইয়াছে মিশ্রণের সাহায্যে। পুরাতনকে ভাঙ্গিয়াই নূতন স্থষ্টি হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রাগ-রাগিণীকে ভাঙ্গিয়া, মিশ্রণের সাহায্যে বাংলা গানের নূতন জীবন দিলেন।

"সংগীতের উদ্দেশ্য" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়-জয়ন্তী বাঁচুন অথবা মরুন আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন" ? ভাব প্রকাশে সহায়তা করে এবং কাব্যের সৌন্দর্য্য ও রস ফুটিয়া উঠে এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজন মত রাগ-রাগিণীর সাহায্য লইতেন। "আছে তুঃখ, আছে মৃত্যু" গানটির কথা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। মিশ্রণের অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় এই গানটিকে বিশ্লেষণ করিলে। ইহাতে ললিত, বিভাষ, রামকেলী ও আশাবরী সহজ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। গানটির ভাব অনুযায়ী যেখানে যেমনটির প্রয়োজন ঠিক তেমনটি সেই খানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মিশ্রণ কিন্তু পৃথকভাবে ধরিবার উপায় নাই। গানটি শুনিবার সময় সমগ্র ব্যঞ্জনাটুকু উপলব্ধি করা যায়, এই খানেই মিশ্রণের বাহাতুরী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মিশ্রণের রাজা। বাল্যকালে দরবারী সংগীতের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি মিশ্রণের দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে। ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং রাগ-রাগিণী গুলিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অপূর্ব মিশ্রণের দ্বারা রবীন্দ্র-সংগীতে রস বোধ গভীর হইয়াছে এবং সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

মিশ্রণের দিক্ হইতে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে এমন কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল।

১। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু।

২। প্রখর তপন তাপে।

৩। আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ।

৪। চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো তৃষ্ণা আমার বক্ষজুড়ে।

রবীন্দ্র-সংগীত সংখ্যায় বিপুল এবং ইহা তিনটী স্তরে বিভক্ত। প্রথম যুগের গান, মধ্যযুগের গান এবং শেষযুগের গান। রবীন্দ্র-সংগীতে এই তিনটী যুগই হইল তিনটী স্তর। "রবীন্দ্র-সংগীতে মিশ্রণ" একটি পৃথক স্তর বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং এই স্তরেও বিপুল সংখ্যক গান আছে। সবগুলির পরিচয় ও দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্র-সংগীতানুরাগী ও রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার্থীরা যদি রাগ-সংগীতে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া ও রবীন্দ্র-কাব্যে প্রবিষ্ট হইয়া গবেষণা করেন তাহা হইলে রবীন্দ্র-সংগীতে মিশ্রণ কতদূর সার্থক হইয়াছে এবং মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের যে কি অসীম ক্ষমতা ছিল সেই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।

রবীন্দ্র-সংগীতে লোক-সংগীতের প্রভাব

সুর-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী রাগ-সংগীতকে কেন্দ্র করিয়াই সংগীত রচনা করেন নাই। বাংলার লোক-সংগীতকে তিনি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সংগীতে লোক-সংগীতের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে আছে। গ্রামে জমিদারীর কাজ তত্ত্বাবধান করিবার সময় কবি গ্রামের বাউলদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সেই গ্রামাঞ্চলের গান তাঁহার অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাহাদের সহজ সরল ভাষা ও সুরে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হন। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ ক'রেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হোত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ ক'রেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে"।

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কি গভীরভাবেই বাউলদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের সুরে তিনি কতকগুলি গান রচনা করেন। যথা :—

মূল গান—		রবীন্দ্রনাথের গান—
১। হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে	...	"যদি তোর ডাক শুনে"
২। মন মাঝি সামাল সামাল	...	"এবার তোর মরা গাঙ্গে"
৩। আমি কোথায় পাব তারে	...	"আমার সোনার বাংলা"

ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রবীন্দ্র-সংগীতের বিভিন্ন পর্য্যায়েই বাউল গানের সুর আছে। কেবলমাত্র ধর্ম-মূলক বা অধ্যাত্ম্য-বিষয়ক গানে নহে। প্রেমবৈচিত্র্য, ঋতুবিষয়ক-সংগীত, স্বদেশী-সংগীত ইত্যাদিতেও বাউল সুর আছে। রাগ-রাগিণীর সহিত অতি সহজ ও সুন্দর ভাবে বাউল সুরের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাহাতেই রবীন্দ্র-বাউল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়াছে। বাংলার বাউলদের সুর গ্রহণ করিয়াও সেই সুর আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্র-বাউলের বৈশিষ্ট্য হইল, অনবদ্য ভাষা, বাউল সুরের সহিত রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে সুরের বৈচিত্র্য এবং বিষয়-বৈচিত্র্য। বাউল গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "এমন বাউল গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলেনা, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য-রচনা, তেমনি ভক্তিরস মিশেছে। লোক সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করিনে"।

রবীন্দ্রনাথ দেশী-সংগীতকে গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাউল, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, সারি গান ইত্যাদির অনুকরণে রচিত গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নিপুণ সুর-মিশ্রণে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীত-রচনার মধ্যে বাউল, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, সারি, ভাটীয়ালী ইত্যাদি দেশী-সংগীতের অন্তর্গত সুরগুলি এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার্থীর কণ্ঠ সাধনা ও রাগ-জ্ঞান

যে কোন প্রকার সংগীতকে আয়ত্ত করিতে হইলে সাধনা করিতে হইবে।

রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য ও গাহিবার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে হইলে মার্জিত কণ্ঠস্বর, টপ্পা অংগের অলংকরণ, মীড়, স্বর-জ্ঞান এবং শ্রুতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

রবীন্দ্র-সংগীতে পারদর্শী হইতে হইলে স্বর-ক্ষেপণের লঘুত্ব ও গুরুত্ব, সংযত কণ্ঠস্বর, মীড়ের প্রয়োগ, সাবলীল উচ্চারণ-ভঙ্গী অতি সুনিপুণভাবে চর্চা করা প্রয়োজন।

মার্গ-সংগীতের ন্যায় রবীন্দ্র-সংগীতের গায়ন-পদ্ধতিও অনুশীলন সাপেক্ষ। মার্গ সংগীতের ধারাকে ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্র-সংগীত অনুশীলন করিতে হইবে। গানের দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করিলে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। কবিগুরুর একটি গানের উল্লেখ করিতেছি "আমি তোমার সংগে বেঁধেছি আমার প্রাণ"। এই গানটিকে যথাযথভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে এই গানের রাগের রূপ এবং একাধিক রাগের মিশ্রণ কি ভাবে ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। ইমন, পূরবী, ভৈরবী, কানাড়া, খাম্বাজ, কাফী, ভৈঁরো, তোড়ী, বসন্ত, বাহার, মল্লার ও বাগেশ্রী রাগে অসংখ্য গান রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে আছে। তাহা ছাড়া মধ্য বয়স হইতে শেষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি যে সব গান রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুই বা ততোধিক রাগের মিশ্রণ করিয়াছেন। সেই মিশ্রণ গানের ভাব প্রকাশে সহায়তা করিয়াছে এবং রবীন্দ্র-সংগীতের অপূর্ব সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছে। মিশ্রণের দিক্ হইতে "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু" গানটি অনবদ্য সৃষ্টি। আশাবরী, রামকেলী, ললিত ও বিভাষ এই চারটি রাগের সমন্বয় ঘটিয়াছে এই গানটিতে। গানটি গাহিবার কালে কিন্তু কোন রাগের কথা মনে স্থান পায়না।

ইহার একমাত্র কারণ অপূর্ব মিশ্রণ-দক্ষতা। ভারতীয় সংগীত-শাস্ত্রে, সা, রে, গ, ম ইত্যাদি সাতটি স্বরকে কোন না কোন ভাবের সূচক বলা হইয়া থাকে। রবীন্দ্র-সংগীতকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে কি ভাবে স্বরের রূপগুলি এই সংগীতে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-জীবনের গোড়াপত্তন হইয়াছিল বিশুদ্ধ মার্গ-সংগীতে। পরিবারের সাংগীতিক পরিবেশ, সেকালের গুণীদের সংগীত শ্রবণ ও তাঁহাদের নিকট সংগীত শিক্ষা তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছিল। তিনি উপলব্ধি করিয়া ছিলেন, রাগ-রাগিণীর মূল রসটি, তাহাদের রূপ ও প্রকৃতি।

"দীপ নিবে গেছে মম" কবিগুরুর একটি বিখ্যাত গান। বেহাগ রাগে ও ঝাঁপতালে গানটি রচিত। গানটি গাহিবার কালে লক্ষণীয় বিষয় এই যে বারবার সুরটি ন্যাস করিতেছে গান্ধারে। বেহাগের বাদী গান্ধার এবং সম্বাদী নিষাদ। কবিগুরু এই গানটিতে বেহাগের বাদী ও সম্বাদীকে ঠিক মর্য্যাদা দিয়াছেন। কোমল নিষাদ বেহাগে বর্জিত স্বর বলিয়া ইহার প্রয়োগ শাস্ত্র সম্মত নহে। কিন্তু শাস্ত্রে ইহাও আছে যে বর্জিত স্বরকে বিবাদী স্বররূপে যদি নিপুণভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে রাগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। উপরি উক্ত গানটির একস্থানে আছে "ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদি রে" এই খানে ক্লান্তি ও অবসন্নতা এই ভাবটিকে প্রকাশ করিবার জন্য কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই খানেই রবীন্দ্রনাথ সার্থক রূপকার। রাগের মেজাজ, (Sentiment) তাহার চলন ও গতি সম্বন্ধে যদি বিশেষ জ্ঞান থাকে তাহা হইলে রবীন্দ্র-সংগীত গাওয়া অতি সুন্দর হইয়া উঠিবে। আর একটি গানের দৃষ্টান্ত দিয়া এই আলোচনা শেষ করিব। "বুঝি বেলা বহে যায়" গানটি ভীমপলশ্রী রাগকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। গানের প্রথম অংশে ভীমপলশ্রীর রূপটি পরিষ্কার কিন্তু অন্তরার শেষে "কই সে হোল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়" এই পংক্তিটিতে হঠাৎ কোমল ধৈবতের প্রয়োগ সার্থক হইয়াছে। আমরা এ কথা জানি

যে ভীমপলশ্রীতে কোমল ধৈবত ব্যবহৃত হয় না কিন্তু এমনই প্রয়োগ নৈপুণ্য যে ইহার ব্যবহারে গানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে আসিল না, সেই মালা গাঁথা ব্যর্থ হইল এই বিফলতার ভাবটি সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোমল ধৈবতের ব্যবহার সহ "কোথা যে উধাও হোল" গানটি মিঞামল্লার রাগের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। মিঞামল্লারের প্রকৃতি জানা না থাকিলে উপরি উক্ত গানটি মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া গাওয়া যায় না। এই জন্যই রবীন্দ্র-সংগীতশিক্ষার্থীদের পক্ষে রাগ-সংগীত বিশেষভাবে আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়

—০—

দত্তিল—চতুর্থ—পঞ্চম শতাব্দী

দত্তিল সংগীত বিষয়ে "দত্তিলম্" নামক গ্রন্থের রচয়িতা। চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালের অনেক গ্রন্থকার দত্তিলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দত্তিল স্বয়ং ও নিজ গ্রন্থে পূর্ববর্ত্তীকালের নারদ, কোহল ও বিশাখিত প্রভৃতি গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কাল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। এই কারণে দত্তিলের কাল নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। সুতরাং দত্তিলের আবির্ভাব কাল চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। দত্তিল-রচিত "দত্তিলম্" সংগীত সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ, ইহাতে তাল স্বর ও জাতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা হউক গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও তৎকালে সংগীতের রূপ কি প্রকার ছিল উক্ত গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায়।

শার্ঙ্গদেব—ত্রয়োদশ শতাব্দী

শাস্ত্রীয় সংগীত সম্বন্ধে অদ্যাবধি যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে শার্ঙ্গদেব রচিত "সংগীত-রত্নাকর" তৎসমুদয়ের শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত। তাঁহার পিতা সোঢল কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। পরে তিনি বাসস্থান পরিবর্ত্তন ক্রমে দক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। তথায় তিনি দেবগিরি রাজ্যের যাদব রাজার উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। সোঢলের পুত্র আচার্য্য শার্ঙ্গদেবও দেবগিরি রাজ্যে বাদ্শাহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন (১২১০—১২৪৭ খৃঃ)।

শার্ঙ্গদেবের প্রসিদ্ধ সংগীত-গ্রন্থ সংগীত-রত্নাকরের টীকাকার, সিংহ-ভূপালের লিখিত গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে প্রাক-শার্ঙ্গদেব যুগের শাস্ত্রীয় সংগীত-গ্রন্থোক্ত দুর্বোধ্য বিষয়গুলি শার্ঙ্গদেব তদীয় সংগীত-রত্নাকর গ্রন্থে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন।

যে সকল গ্রন্থকর্ত্তার মত সমূহ মন্থন করিয়া শার্ঙ্গদেব তদীয় সংগীত রত্নাকরে সার সঞ্চয়ন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সদাশিব, ব্রহ্মা, ভরত, নারদ, তুম্বরু, রাবণ, নন্দিকেশ্বর, মতঙ্গ, কশ্যপ, রাহল, লোল্লট, (ভরত-নাট্য-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা) প্রভৃতি এবং আরো অনেক সংগীতগ্রন্থকার।

শার্ঙ্গদেব তদীয় গ্রন্থে নাদ, শ্রুতি, স্বর, মূর্চ্ছনা, জাতি ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব-লিখিত সংগীত-গ্রন্থাদি হইতে বিষয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংগীতের মধ্যে এক সমন্বয় আনয়ন করেন। তিনি ৭টি শুদ্ধস্বর, ১২টি বিকৃতস্বর এবং ১৮টি জাতি মানিয়া লন।

স্বর ও জাতি বর্ণনার পর রাগের জাতি হইতে গ্রাম এবং গ্রাম-রাগ হইতে অপরাপর রাগের বিকাশ হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেবের স্বর ও রাগ আধুনিককালের স্বর ও রাগ হইতে পৃথক, কারণ তিনি যে শ্রুতিস্থান নির্দেশ করিয়াছেন তাহা আজকালের শ্রুতি হইতে অন্যরূপ। সংগীত-রত্নাকরে বর্ণিত রাগ সমূহ বর্ত্তমানকালের উপযোগী নহে। তথাপি সেই গ্রন্থের অপরাপর ভাগে সংগীত সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহা আজও আমাদের বিশেষ প্রয়োজনে আসে। শার্ঙ্গদেবকৃত শুদ্ধ ঠাট "মুখারী" আধুনিক কর্ণাটী-সংগীতে কনকাঙ্গী ঠাট বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

আমীরখসরু—ত্রয়োদশ শতাব্দী

আমীরখসরুর পিতার নাম আমীর মহম্মদ সৈফুদ্দীন। ইনি পারস্য দেশের খোরাসান প্রদেশের লোক। তিনি স্বদেশ হইতে হিন্দুস্থানে আসার পর এটোয়া জেলার পটিয়ালি গ্রামে ১২৩৪ মতান্তরে ১২৫৩ সালে আমীর খসরুর জন্ম হয়। খসরু অতিশয় বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীতে গিয়াসুদ্দীন বলবন্তের আশ্রয়ে কিছুকাল ছিলেন। এই ভাবে ভারতে থাকাকালীন তিনি পরবর্ত্তী সময়ে আলাউদ্দীন খিলিজীর সভা-গায়ক পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ দার্শনিক, কবি ও গায়ক। তদুপরি তিনি আলাউদ্দীন খিলিজীর ধর্ম্মগুরু এবং প্রধান মন্ত্রীও ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি ভারতীয় রাগের সহিত পারস্য দেশীয় রাগ মিশ্রণ দ্বারা অনেক নূতন নূতন লোক-রঞ্জন রাগের সৃষ্টি করেন। পিতার শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই আমীরখসরু প্রতিভা ও বুদ্ধি বলে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

তিনিই সর্ব প্রথম খেয়াল গান রচনা করেন—সেই হেতু তাঁহাকে খেয়াল গানের জনক বলা হইয়া থাকে। তিনি অপর এক নূতন ধারার সংগীত সৃষ্টি করেন তাহাকে কাওয়ালী গান বলা হইত। ভারতীয় রাগের সহিত পারস্য দেশীয় রাগের সংমিশ্রণে তিনি ইমন ও হিন্দোল এই দুইটি বিখ্যাত রাগ সৃষ্টি করেন। একাধারে তিনি খেয়াল, কাওয়ালী প্রভৃতি গানের স্রষ্টা এবং সেতারের ও আবিষ্কর্ত্তা। তিনটি তার সংযোগে (সেহ = তিন) তিনি এই যন্ত্রটি তৈয়ার করেন। তিন তারের যন্ত্র বলিয়াই এর নাম সেতার। পরবর্ত্তীকালে বিলাস খান বংশীয় মসীদ খাঁ সেতারের তার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন ও চিকারীর তার যোজনা করিয়া ধ্রুপদ ভাঙ্গা বিলম্বিত গৎ এর প্রচলন ও সেতারের বহুল প্রচার তিনিই করেন। মসীদ খাঁর নামানুসারে সেতারের বিলম্বিত গৎকে মসিদখানি গৎ বলা হইয়া থাকে। সেতারে তানতোড়ার প্রচলনও তিনিই করেন। বর্ত্তমানকালে প্রচলিত সেতার পূর্ব কথিত তিন তারের সেতারেরই উন্নত সংস্করণ। পোস্তা,

কাওয়ালী, আড়া চৌতাল, ঝুমরা প্রভৃতি তালও আমীরখসরুরই আবিষ্কার। তিনি ফার্সি ভাষায় "শের" যুক্ত এক প্রকার তারানার সৃষ্টি করেন যাহা এক তালে গাওয়া হইত। তিনি ফার্সি ও আরবী ভাষায় অনেক গীত রচনা করিয়াছিলেন—সে সমুদয় উত্তর ভারতীয় সংগীতের ঢং এ গাওয়া হইত। ৭২ বৎসর বয়সে আমীরখসরু দেহ ত্যাগ করেন।

গোপাল নায়ক—ত্রয়োদশ শতাব্দী

আলাউদ্দীন খিলিজীর রাজত্বকালে (১২৬৪ খৃঃ) গোপাল নায়ক দাক্ষিণাত্যের দেবগিরির রাজা বামদেব যাদবের আশ্রয়ে বাস করিতে ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। আলাউদ্দীন খিলিজী কর্তৃক দেবগিরি রাজ্য আক্রান্ত হইলে আমীরখসরু ও দেবগিরি রাজ-দরবারের গায়ক গোপাল নায়কের মধ্যে সংগীত প্রতিযোগীতা হয়। এই প্রতিযোগীতায় আমীর খসরু ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গোপাল নায়ককে পর্য্যদস্ত করেন। কিন্তু আমীরখসরু গোপাল নায়কের বিদ্যাবত্তায় এত মুগ্ধ হন যে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসেন। আলাউদ্দীন তাঁহাকে সসম্মানে সভা-গায়ক নিযুক্ত করেন। গোপাল নায়ক সম্বন্ধে অদ্যাপি এই প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে যখনই তিনি দিল্লীর বাহিরে যাইতেন তখনই তাঁহার গাড়ীর বলদের গলায় সময়োপযোগী সংগীত-ধ্বনি-নিঃসারী ঘণ্টা বাঁধিয়া দিতেন।

ঐতিহাসিকদের মতে গোপাল নায়ক ১২৬৪—৬৫ সাল মধ্যে দিল্লীতে আসেন। তৎকালে সংস্কৃত সংগীত-গ্রন্থাদিতে ধ্রুপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয় যে গোপাল নায়ক ধ্রুপদ গাহিতেন না এবং তৎকালে অন্যান্য প্রকার প্রবন্ধ গানেরই প্রচলন ছিল এবং সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগুই ছিল সে সকল গানের ভাষা। মতান্তরে এরূপ

জানিতে পারা যায় যে গোপাল নায়ক সংগীতে দিগ্বিজয় করিবার ইচ্ছায় দিল্লীতে আসেন এবং আমীরখসরুর সহিত তাঁহার সংগীত-প্রতিযোগিতা হইলে আলাউদ্দীন খিলিজী তাঁহার গানে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সভা-গায়ক নিযুক্ত করেন। গোপাল নায়ক অবিসংবাদিতভাবে উচ্চস্তরের সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সংগীত-গুণী কেহ ছিল বলিয়া জানা যায় না।

কল্লিনাথ লিখিত সংগীত-রত্নাকরের টীকা "কলানিধির" তানাধ্যায়ে গোপাল নায়কের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসার উল্লেখ রহিয়াছে। এরূপ জানা যায় যে গোপাল নায়ক নিজ বাটীতে বসিয়া যে সকল রাগ-রাগিণীর আলাপ করিতেন আমীরখসরু তাঁহার অজ্ঞাতসারে সেই সকল রাগ-রাগিণী শুনিতেন ও আত্মসাৎ করিতেন।

পূর্বী, দেশকার, গৌরী, গুণকেলি, খট্ প্রভৃতি রাগ গোপাল নায়কেরই সৃষ্টি। গোপাল নায়ক শেষ জীবন দিল্লীতেই অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোবিন্দ অধিকারী—ত্রয়োদশ শতাব্দী

ইনি বাংলার একজন প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। অনুমান ১২০৫ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সমীপবর্ত্তী জঙ্গিপাড়া গ্রামে বৈরাগীকূলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন। অতঃপর হাওড়া জেলার অন্তর্গত ধুরখালি গ্রামনিবাসী বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া গোলোকদাস অধিকারীর নিকট কীর্ত্তনগান শিক্ষা করেন এবং কিছুকাল শিক্ষার পর একটি যাত্রার দল গঠন করেন। "কালীয়দমন" পালা অভিনয় উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ে তিনি অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ অধিকারী মহাশয় নিজে দূতী সাজিতেন এবং অপূর্ব অভিনয়ের দ্বারা দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার এই দূতীগিরির অভিনয় দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে দর্শকের আগমন হইত। তাঁহার গভীর ভাব-পূর্ণ ও সুসংযত অনুপ্রাস-বহুল গীতরচনা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিত। তাঁহার লিখিত ভক্তিরসাশ্রিত গানে শ্রোতৃগণ অভিভূত হইয়া পড়িতেন। তিনি বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে ভাব উদ্ধার করিয়া সংগীত রচনা করিতেন এবং সেই সংগীত তদীয় সুকণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া অতি সহজেই সকলের হৃদয় স্পর্শ করিত।

তিনি একাধারে কথকতা, যাত্রা এবং কীর্ত্তনে পারদর্শী ছিলেন। যাত্রা গান গাহিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিত্তশালী হন। তাঁহার যাত্রার দল তৎকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। তিনি "শুক-সারীর পালা" ও "চূড়া-নূপুরের দ্বন্দ্ব" রচনা করেন। এই দুটির মধ্যেই বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রভাব বর্ত্তমান। ইনি স্বনামখ্যাত যাত্রাওয়ালা পরমানন্দের দলের একজন "বালক" ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কাহারও মতে ইনি পূর্ব-বঙ্গের জগদীশ গাঙ্গুলীর যাত্রার দলের "বালক" ছিলেন। অবশ্য পরবর্ত্তী সময়ে তিনি যাত্রাওয়ালা হিসাবে প্রভূত যশের অধিকারী হন। অপুত্রক অবস্থায় অনুমান ১২৭৭ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিদ্যাপতি—চতুর্দশ শতাব্দী

তিনি প্রাচীনযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন এবং বাংলাদেশেই তাঁর আবির্ভাব হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহার জন্মের স্থান ও জন্ম-কাল নিশ্চিতভাবে অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। যাহা হউক এরূপ অনুমিত হয় যে তিনি বাংলাদেশে বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করিয়া মিথিলায় যান এবং সেখানে রাজা শিবসিংহের

আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। রাজাবাহাদুর বিহারের অন্তর্গত বিসপী নামক গ্রাম বিদ্যাপতিকে দান করেন। ঐ গ্রামে কবি বিদ্যাপতির বংশধরগণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। তিনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু পদাবলী রচনা করেন। তাঁহার লিখিত পদ সমূহ ভাবলালিত্য মনোহারিত্ব ও পাণ্ডিত্যের সমাবেশে পরিপূর্ণ। চৈতন্যদেব তাঁহার রচিত পদাবলী-কীর্ত্তন শুনিয়া মুগ্ধ ও ভাবে বিভোর হইতেন। বিদ্যাপতি বিহারবাসী হওয়ায় তাঁহার রচনাবলীতে বহু হিন্দী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তিনি গয়াপত্তন, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, পুরুষ-পরীক্ষা, বিবাদসার, দান-বাক্যাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে বিদ্যাপতি যখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হন তখন চৈতন্য দেবের আবির্ভাব হয়। বিদ্যাপতি ১৪০০ হইতে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন।

পণ্ডিত লোচন—চতুর্থ শতাব্দী

পণ্ডিত লোচনের সময় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ বলিয়া কথিত আছে। বিহারের মজঃফরপুর জেলায় তাঁহার জন্ম-স্থান। তিনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন, স্বয়ং সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হওয়ায় প্রাচীন ও তৎকালীন সংগীতশাস্ত্র অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। অতঃপর তিনি যত্নসহকারে সংগীত বিদ্যার প্রভুত চর্চ্চা করেন। তিনি প্রশান্ত মূর্ত্তি, বুদ্ধিমান, নিষ্ঠাচারী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন।

উত্তর ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে তিনি রাগ-তরঙ্গিণী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং রাগ-সর্বসংগ্রহ নামক সংগীত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার সময় সংগীতে বহু পরিবর্ত্তন আসে এবং প্রাচীনযুগের সংগীতের পাশাপাশি নবীনযুগের পরিবর্ত্তনশীলতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া লোচন যে গ্রন্থ দুইখানি

রচনা করিলেন তাহা দ্বারা সংগীত জগতের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। তিনি তদীয় গ্রন্থে সাতটি স্বর ও বাইশটি শ্রুতির বিষয় উল্লেখ করেন এবং ক্রমানুসারে বিভিন্ন সাতটি স্বরের অন্তর্গত শ্রুতি-সংখ্যা ও বিভাগ নিম্নলিখিত মতে নির্দ্ধারিত করেন।

স্বর	শ্রুতি	স্বর	শ্রুতি
সা	৪	ম	৪
রে	৩	প	৪
গ	২	ধ	৩
		নি	২
		মোট	২২

তিনি প্রাচীন রাগ-রাগিণী পদ্ধতি পরিহার করিয়া স্বয়ং ঠাট পদ্ধতি প্রবর্ত্তন পূর্বক অনেক রাগ সৃষ্টি করেন এবং ১২টি ঠাট মানিয়া লইয়া রাগ সমূহকে ঐ ১২টি ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করেন।

উল্লিখিত গ্রন্থ দুইখানি রচনা করিয়া তিনি প্রভুত যশের অধিকারী হন। সুপ্রসিদ্ধ সংগীত-গুণী আমীরখস্রুর আনুকূল্য তদীয় গ্রন্থলিখিত মত প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। ভারতীয়-সংগীতের ক্ষেত্রে পণ্ডিত লোচনের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

সুলতান হুসেন শর্কী—চতুর্থ শতাব্দী

১৩৩৬ ইং সালে জৌনপুরের সুবেদার খাজা ইয়াস তত্রত্য তুগলকবংশের রাজার দুর্বলতার সুযোগে তথায় নিজে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। প্রায় ৬০ বৎসরকাল ঐ রাজ্য স্বতন্ত্রভাবে থাকে। অতঃপর ১৪৫৮ ইং সালে সুলতান হুসেন শর্কী যে ভাবেই হউক জৌনপুরের গদীতে বসেন। সে সময় দিল্লীর বাদশাহ বহলোল লোদী তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি বাংলাদেশের রাজার আশ্রয়ে চলিয়া যান ও শেষ জীবন পর্য্যন্ত তথায়ই বসবাস করেন। ১৪৯৯ ইং সনে বাংলাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সুলতান হুসেন নিজ বংশের শেষ রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংগীতানুরাগী। খেয়াল গানের প্রচার ও প্রসারের প্রতি তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন—এবং এই কারণেই তিনি চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ঐ সময় তিনি খেয়াল গানের গায়কীর মধ্যে একটি পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং জৌনপুরী নামে একটি রাগ সৃষ্টি করেন যাহা অদ্যাবধি ঐ নামে সর্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে।

———

পণ্ডিত কল্লিনাথ—পঞ্চম শতাব্দী

পণ্ডিত কল্লিনাথ দক্ষিণ ভারতের বিজানগরের মহারাজা প্রতাপ দেওজীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে কল্লিনাথের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। মহারাজার বিশেষ অনুরোধে কল্লিনাথ শার্ঙ্গদেবকৃত সংগীত রত্নাকরের টীকা "কলানিধি" রচনা করেন। সংগীত রত্নাকরের দুর্ব্বোধ্য বিষয়-বস্তুগুলি কল্লিনাথের টীকা মুল্যে সর্বসাধারণের পক্ষে সহজ বোধ্য হইয়া উঠে। রাজা প্রতাপদেও ১৪৫৬—১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে পণ্ডিত কল্লিনাথের অভ্যুদয় ঘটে ও তিনি খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। রাজদরবারে সভাপণ্ডিত থাকা-কালীন

তিনি মহারাজা কর্ত্তৃক "চতুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়া "চতুর কাল্লিনাথ" নামে পরিচিত হন। তৎকালীন বহু পণ্ডিত মনে করেন কল্লিনাথ কেবল যে সংগীত রত্নাকরের টীকাই লিখিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি অন্যান্য অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। যদিও অদ্যাবধি সেই সব গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

———

মানসিংহ তোমর—পঞ্চদশ শতাব্দী

সংগীতের ক্ষেত্রে গোয়ালিয়রের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। গোয়ালিয়রের তোমর বংশীয় নৃপতিগণ চিরদিন সংগীতকলা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। এই কারণে বহু সংগীত ও সাহিত্যিক রাজদরবারের শোভাবর্দ্ধন করিতেন। এই বংশেই সংগীতগুণী মহারাজা মানসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল ১৪৮৬—১৫১৮ খৃষ্টাব্দ। তৎকালে তাঁহার সভায় অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক ছিলেন। তাঁহার মধ্যে বৈজুবাওরা, নায়ক বক্স্থ, চর্য্যভগবান, ঘণ্ডু ও রামদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে সুলতানের শেখ বাহাউদ্দিন জ্যাকেরিয়া নানা রাগের মিশ্রণে নূতন নূতন ধুন তৈরী করিতেছিলেন। গুজরাটের সুলতান হোসেনও ভারতীয় রাগের সহিত ইরানী-সংগীতের সংমিশ্রণ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে মহারাজা মানসিংহ জনসাধারণের সংগীতে রুচি যাহাতে মার্জিত হয় এই উদ্দেশ্যে রাজদরবারের গায়কগণ দ্বারা ধ্রুপদের প্রচার ও প্রাচীন-সংগীতকে রক্ষা করার নিমিত্ত নিজেকে নিয়োগ করিলেন।

তিনি তাঁহার সভাগায়ক ও বাদকদিগের সহায়তায় বহু রাগের ব্যাখ্যা সহ "মানকুতূহল" নামক একখানি সংগীত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ফকিরউল্লা ফার্সি ভাষায় ঐ গ্রন্থখানির অনুবাদ করেন। মহারাজা ধ্রুপদকে জনসমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন; এই কারণে সংগীতজগতে

গোয়ালিয়র একটি সংগীত-তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। মানকুতূহলে মহারাজ লিখিত পদসমূহ হইতে তদীয় গভীর সাহিত্যিক জ্ঞান ও সংগীতে অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শণ পাওয়া যায়। মানকুতূহল ফকিরউল্লা কর্ত্তৃক "সংগীত-দর্পণ" নামে ফার্‌সি ভাষায় অনূদিত হয়; তাহাতে ফকিরউল্লা রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক ধ্রুপদগানের আবিষ্কার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। মান সিংহের এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের নিমিত্ত সংগীতজগৎ তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে। ধ্রুপদগানে মহারাজা মানসিংহের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। কিংবদন্তী আছে যে গোয়ালিয়র হইতে এগার মাইল দূরবর্ত্তী রাই গ্রামে গুর্জরবংশ-জাত মৃগনয়নী নামে একটি পরমাসুন্দরী সংগীত-নিপুণা দরিদ্র বালিকা বাস করিত। মানসিংহ তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। মৃগনয়নীর অনুরোধে তাঁহার জন্য "গুজরী মহল" নামে একটি পৃথক মহল তৈয়ারী করেন এবং গোয়ালিয়র হইতে রাইগ্রাম পর্য্যন্ত একাদশ মাইল ব্যাপী জলপথ নির্মাণ করেন। মহারাণী সংগীত শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহারাজা মানসিংহ তাঁহার সভাগায়ক বৈজুকে মহারাণীর শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। গুর্জর কুলোদ্ভবা মহারাণীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত বৈজু গুর্জরী-তোড়ী ও মঙ্গল-গুর্জরী নামক দুইটি রাগ সৃষ্টি করেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মানসিংহ তোমর লোকান্তরিত হন।

চণ্ডীদাস—পঞ্চদশ শতাব্দী

১৩০৯ শকে ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগ্‌চী। প্রাচীনকালের বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর বাঁশুলী দেবীর (বিশালাক্ষীর) পূজারী নিযুক্ত হন। অদ্যাপি সেই বাঁশুলী দেবীর মন্দির বর্ত্তমান আছে। রজকিনী রামী

ঐ মন্দিরের সেবিকা ছিলেন। চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর প্রতি নিষ্কামভাবে আসক্ত হন এবং তাঁহাকে স্বীয় সাধনার সঙ্গিনী করেন। উভয়ের মধ্যে প্রেমবন্ধন এত দৃঢ় হয় যে চণ্ডীদাসের অনেক গানে রামীর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবের পারিপাট্য, ভাষার লালিত্য, রসমাধুর্য্য এবং সুললিত ছন্দের জন্য চণ্ডীদাস বৈষ্ণবপদাবলীর পদকর্ত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। বাংলা ভাষার শৈশবকালে চণ্ডীদাসের এই সরস পদাবলী-সৃষ্টি এক বিস্ময়ের বিষয়। চণ্ডীদাস অতি সহজ ও সরল ভাষায় মনের ভাবকে যে ভাবে রূপ দান করিয়াছেন এমন আর কেহই পারেন নাই। চণ্ডীদাসের পদ অতি সহজভাবেই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। ইনি চৈতন্যদেবের পূর্ববর্ত্তীকালের লোক। চণ্ডীদাস কবি-বিদ্যাপতির নাম শুনিতে পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হন। ঘটনা ক্রমে একদা গঙ্গাতীরে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটে। উভয়েই উভয়ের কবিত্বে মুগ্ধ হন এবং পরস্পর মিত্রতাপাশে বদ্ধ হন। পদাবলীকীর্ত্তনে চণ্ডীদাসের পদ অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলার এই মরমী কবি তাঁহার পদাবলী দ্বারা বৈষ্ণব কুলের অন্তর জয় করেন। তাঁহার রস-মধুর পদের জন্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাঁহার আসন চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন।

জয়দেব—পঞ্চদশ শতাব্দী

বাংলাদেশের অন্তর্গত বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব (কেন্দুলি) গ্রামে ভক্ত-কবি জয়দেবের জন্ম হয়। অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামা দেবী। জয়দেব অতি অল্পবয়সেই বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি বিবাহ করিয়া গৃহবাসী হন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। তিনি অত্যন্ত গুণী রমণী ছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে পদ্মাবতীর পিতা পদ্মাবতী

সহ জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইয়া পদ্মাবতীকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী রূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু জয়দেব তাহাতে অস্বীকৃত হইলে পদ্মাবতীকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া পদ্মাবতীর পিতা চলিয়া যান। জয়দেব পদ্মাবতীকে চলিয়া যাইতে বলেন কিন্তু পদ্মাবতী জয়দেবকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন এবং অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে অসমর্থ ও চিরদিন জয়দেবের সেবায় জীবন যাপন করিবেন এই সিদ্ধান্ত জানাইলে জয়দেব তাঁহাকে বিবাহ করেন। পদ্মাবতীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করার পর জয়দেব বিখ্যাত "গীতগোবিন্দ" কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। গীতগোবিন্দের ন্যায় সুললিত মধুর গীতিকাব্য সংস্কৃত ভাষায় আর নাই।

গীতগোবিন্দ রচনা কালে একদা "স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" এই পর্য্যন্ত লেখার পর ভাবানুযায়ী পদ যোজনায় অসমর্থ হইয়া পদটি অসম্পূর্ণ রাখিয়াই জয়দেব স্নান করিতে চলিয়া যান। কিছুক্ষণ পরেই পদ্মাবতী দেখিলেন যে জয়দেব স্নানের পর গৃহে ফিরিয়া গ্রন্থমধ্যে কি লিখিলেন এবং আহারান্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পদ্মাবতী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিতেছেন এমন সময় জয়দেব ফিরিয়া আসিয়া পত্নীকে তাঁহার পূর্বে আহার করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পদ্মাবতী বলেন "এই মাত্র যে তুমি গ্রন্থে কি লিখিলে ও আহার করিয়া বাহিরে গেলে, আমিতো তোমার প্রসাদ গ্রহণ করিতেছি"। জয়দেব পুঁথি খুলিয়া তাঁহার অসম্পূর্ণ কবিতার সঙ্গে "দেহি পদ পল্লবমুদারম্‌" এই কয়টি কথা তাঁহার নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং বুঝিতে পারেন যে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সংগীতাংশ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। এই অলৌকিক ঘটনা জয়দেবও তৎপত্নী পদ্মাবতীর অশেষ কৃষ্ণভক্তির পরিচায়ক।

জয়দেব অতিশয় নৃত্যগীত-রসিক ছিলেন। গীতগোবিন্দের গীত অদ্যাপি দক্ষিণ ভারতের কোন কোন মন্দিরে সুর, তাল, নৃত্য ও ভাব সহযোগে গীত হইয়া থাকে। গীতগোবিন্দের গানে রাগ ও তালের নির্দ্দেশ

রহিয়াছে। জয়দেব সস্ত্রীক ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্য্যটনান্তে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ বাটীতে গোবিন্দের বিগ্রহ স্থাপন করেন ও শেষ জীবন গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিজ গ্রামেই দেহরক্ষা করেন।

জয়দেবের স্মৃতি রক্ষাকল্পে প্রতিবৎসর কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলা নামে প্রসিদ্ধ মেলা বসিয়া থাকে।

বৈজুবাওরা—ত্রয়োদশ—চতুর্দ্দশ শতাব্দী

বৈজুবাওরার আসল নাম বৈজুনাথ। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর (১৩শ ১৪শ শতক) রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। গুজরাটের অন্তর্গত চাপানি নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে বৈজুনাথ নাকি জন্মগ্রহণ করেন। নায়ক গোপাল লাল তাঁর সমসাময়িক, বৈজুনাথ প্রাচীন ধ্রুপদ-প্রবন্ধ গানের সাধক ও ধারক ছিলেন। তখনো ঠিক খেয়াল গানের বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই, ধ্রুপদই ছিল অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল প্রবন্ধ গীতরীতির প্রধান অঙ্গ বা উপাদান। বৈজু সংগীতকে জীবনে অধ্যাত্ম সাধনা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধও হইয়াছিলেন। "বাওরা" অর্থে পাগল, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি ও আরাধনায় তিনি পাগল বা একান্ত অনুরক্ত। শোনা যায়, তাঁহার গানে রাগ-রাগিণী মুর্ত্তিমান হইয়া বুদ্ধিজীবী মানুষ শুধু নয়, সকল রকম জীবজন্তুদের হৃদয়ও দ্রবীভূত করিত।

শোনা যায় সুলতান আলাউদ্দীনের সভা গায়ক গোপাল নায়ক বৈজুবাওরার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে তিনি বৈজুকে গুরু রূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং দৈবদুর্বিপাকে সুলতানের রোষে তাঁহার প্রাণনাশ ঘটে। বৈজুনাথ বা বৈজুবাওরা ভারতীয় সংগীতাদর্শের একজন জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু ধ্রুপদ গান আজও ভারতীয় শিল্পীদের কণ্ঠে বাঁচিয়া আছে।

শ্রীচৈতন্য—পঞ্চদশ শতাব্দী

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ও শচীদেবীর গর্ভে শ্রীধাম নবদ্বীপে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। তিনি কয়েকটি নামেই পরিচিত। মৃতবৎসা জননীর পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হয় নিমাই। পরে অন্নারম্ভ-কালে নাম করণ করা হয় বিশ্বম্ভর—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ নামেও পরিচিত। পরবর্ত্তীকালে তিনি যখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁহার নাম হয় শ্রীচৈতন্য। এই শেষোক্ত নামেই তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনিই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান প্রবর্ত্তক। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে করেন এবং পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে তাঁহার ধ্যান ধারণা করেন। মতান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের অংশাবতার বলিয়া কথিত হন। কেহ বা বলেন তিনি "ন চ পূর্ণঃ ন চাংশকঃ" তিনি পূর্ণও নহেন অংশও নহেন।

অল্প বয়সেই তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, পুরান, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিলে তিনি মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হন। অল্পকাল পরেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। স্বামী-পুত্র-শোকে অভিভূতা শচীদেবী একমাত্র ভরসাস্থল পুত্র নিমাইকে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহ দেন। অল্পকাল মধ্যেই লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়। শচীদেবী পুনরায় বিষ্ণুপ্রিয়ানাম্নী একটি পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত নিমাইকে বিবাহ দেন। একুশ বৎসর বয়সে নিমাই স্বয়ং চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পাণ্ডিত্যাভিমানী বহুব্যক্তি তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত হইতে লাগিলেন অথচ তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে কেহই তাঁহার উপর ক্ষোভ রাখিতে পারিতেন না। একদিন নিমাই ছাত্রগণ সহ গঙ্গাতীরে বসিয়া শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়, এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তথায় উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ

ব্যঙ্গচ্ছলে নিমাইকে বলিলেন "ওহে নিমাই, শুনিলাম তুমি নাকি মস্ত পণ্ডিত হইয়াছ"। নিমাই সবিনয়ে উত্তর করিলেন "আমি কি জানি, আপনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি, অনুগ্রহ পূর্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন আমরা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করি"। আগন্তুক তৎক্ষণাৎ গঙ্গার মাহাত্ম্য বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া শুনাইলেন। শ্লোকের দোষগুণ বিচার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে নিমাই শ্লোকের অর্থ ও অলঙ্কারের দোষ দেখাইয়া দিলেন। আত্মাভিমানী আগন্তুক তাহাতে নিমাইকে সরস্বতীর বরপুত্র মনে করিয়া তদীয় পাণ্ডিত্যের নিকট পরাভব স্বীকার করেন এবং অচিরে সে স্থান ত্যাগ করেন।

একদা নিমাই রঘুনাথ শিরোমণি সহ নৌকায় গঙ্গা পার হইতেছিলেন। নিমাইর হস্তে ন্যায় শাস্ত্রের টীকা দেখিয়া তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিমাই তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন "নিমাই-পণ্ডিতের টীকা থাকিতে আমার টীকা কে পড়িবে?" এই কথা শুনিবা মাত্র নিমাই স্ব-কৃত টীকা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন।

কিছুকাল পরে নিমাই পিতৃ-পিণ্ড দানার্থ গয়াধামে যান। তথায় বিষ্ণু-পাদ-পদ্মে পিণ্ডদানের পর ঈশ্বরপুরী নামক এক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুর সহিত আলাপে নিমাই'র হৃদয়ে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। কিছুদিন মধ্যেই নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার চিত্ত ভক্তি-রসাপ্লুত হইয়া উঠে ও তিনি দিবারাত্র হরিনাম জপে মগ্ন থাকেন।

নবজীবন লাভ করিয়া নিমাই গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখন নিমাই এর কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান; তিনি কৃষ্ণময় হইলেন এবং ঐ সময় সংসারের কোন বিষয়েই তিনি মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না; এমন কি অধ্যাপনা কার্য্য পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, কারণ, পড়াইবার সময় ও তিনি শুধু হরি কথাই বলিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর

এ সময়ে কৃষ্ণ-ভক্তিতে পরিপ্লাবিত হইয়া যায়। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে পাইয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত নিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন।

ক্রমে নিমাই সংসারের সকল মায়া ত্যাগ করিয়া হরি-সাধনে নিযুক্ত হইবার জন্য পিপাসিত হইয়া উঠিলেন এবং একদা নিশীথ রাত্রে আপন মাতা শচীদেবী, সহধর্ম্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়া ও সহচরগণকে পরিত্যাগ পূর্বক বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কাটোয়াতে উপস্থিত হইয়া তিনি দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য শান্তিপুরে ভক্ত অদ্বৈতের গৃহে যান। সেখানে মাতা শচীদেবী ও ভক্তবৃন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর চৈতন্য নীলাচলে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ ও মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। পুরীতে পৌঁছিবা মাত্রই তাঁহার জগন্নাথ দেবকে দর্শনের তীব্র আকাঙ্খা হইল এবং উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া তিনি জগন্নাথ দেব কে দর্শন ও স্পর্শ করিলেন এবং ভাবাবেগে জগন্নাথের মন্দিরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া তদীয় ভক্তগণ তাঁহার কাণে হরিনাম দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। পুরীর রাজার সভাপণ্ডিত সার্বভৌমের সহিত চৈতন্য দেবের সাক্ষাৎ হইলে ভাগবতের কোন ও শ্লোকের ব্যাখ্যা নিয়া উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। সার্বভৌম একটি শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলে চৈতন্য দেব তার অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শোনান তাহাতে সার্বভৌমের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি চৈতন্য দেবের মতের অনুগামী ভক্ত হইয়া উঠেন। চৈতন্য দেব এই সময় হইতে স্থায়ী ভাবে নীলাচলবাসীই হইলেন। তিনি তাঁহার ভক্তগণ মধ্যে নিত্যানন্দকে দেশে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করার নির্দ্দেশ দেন। ভক্ত হরিদাস ও অপরাপর দু' একজন ভক্ত তাঁহার সঙ্গেই থাকেন। ইতি মধ্যে শ্রীচৈতন্য একবার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতা শচীদেবীর সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ করেন ও ভক্তগণের তাঁহাকে পুনর্বার দর্শন করার বাসনা পূর্ণ করেন। অতঃপর তিনি

কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করতঃ নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-চিন্তায় বিভোর থাকেন। একদা সমুদ্রের নীল জলরাশি দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহা কৃষ্ণের নীল কলেবর জ্ঞানে ঐ নীল সাগরে ঝাঁপ দেন এবং এই ভাবে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে সাগরগর্ভেই তাঁহার তিরোভাব ঘটে।

হরিদাস স্বামী—ষোড়শ শতাব্দী

সংগীতে সিদ্ধ মহাপুরুষ স্বামী হরিদাসের পিতার নাম আশুধীর ও মাতার নাম গঙ্গা। ইঁহারা সারস্বত ব্রাহ্মণ। পাঞ্জাবের মূলতান জিলায় উচ্চগ্রাম নামক জনপদে তাঁহাদের আদিবাস ছিল। তথা হইতে তাঁহারা উত্তর প্রদেশের আলিগড় জিলায় ক্ষেরওয়ালী সড়ক নামক গ্রামে ক্ষেরেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকট পুনর্বসতি স্থাপন করেন। তথায় ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত গণ্ডগ্রামে হরিদাসের জন্ম হয়। পরবর্ত্তীকালে উক্ত গ্রাম হরিদাসপুর নামে খ্যাত হয়। সাধুসন্তদিগের প্রতি হরিদাসের পিতামাতার অপরিসীম ভক্তি থাকায় তৎপুত্র হরিদাস বাল্যকাল হইতে ভক্তি গুণের অধিকারী হন। শৈশবেই সংগীতের প্রতি হরিদাসের গভীর অনুরাগ জন্মে। কিছু-কাল মধ্যেই তাঁহার সংগীত কৃষ্ণভক্তিরসে মিশ্রিত হইয়া এক অনির্বচনীয় রূপ ধারণ করে। ১৫ বৎসর বয়সেই তিনি বৃন্দাবনে যান এবং নিধুবনে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে থাকেন। সেই সময় তাঁহার ভক্তি-সিঞ্চিত সংগীতের রসধারায় সমস্ত বৃন্দাবন ভূমি প্লাবিত হয়। তিনি বৃন্দাবনের তৎকালীন প্রচলিত ব্রজভাষায় শাস্ত্রীয় রাগ ও তালে বহু ধ্রুপদ গান রচনা করেন এবং সেই সংগীত শ্রবণে বৃন্দাবন বাসী মাত্রই মুগ্ধ হন ও অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উক্ত শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে নিম্নোক্ত সংগীতজ্ঞগণের নাম "নাদ বিনোদ" গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—বৈজু, গোপাল নায়ক, মদনরায়, রামদাস, দিবাকর পণ্ডিত, সোমনাথ পণ্ডিত, তন্না মিশ্র (তানসেন) ও রাজা সৌরসেন।

স্বামীজী-রচিত বহু গান সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল এবং অদ্যাবধিও আছে। "সংগীত কল্পদ্রুম" গ্রন্থে তাঁহার রচিত বহুগান পাওয়া যায়। আজকাল ব্রজধামে যে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয় তাহা তিনিই প্রচলিত করেন। ঐ রাসলীলাতে যে সকল সংগীত গাওয়া হয় তৎসমুদয় স্বামীজীরই রচনা। স্বীয় শিষ্যবর্গ ভিন্ন অপর কাহারো সান্নিধ্যে তিনি কখনও গান গাহিতেন না। কিন্তু ভারতীয় অনেক রাজা বাদশাহ তাঁহার গান শুনিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাবনে আসিতেন ও স্বামীজীর কুটীরের পার্শ্বে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার গান শুনিতেন। একদা দিল্লীশ্বর আক্‌বর তানসেনকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে স্বামীজীর গান শুনিতে বৃন্দাবনে যান এবং কুটীরের বাহিরে থাকিয়া স্বামীজীর গান শুনিয়া মুগ্ধ হন। আক্‌বর বাদশাহ তখন স্বামীজীর নিকট নিজপরিচয় প্রদান পূর্বক তাঁহাকে দিল্লীতে যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান কিন্তু স্বামীজী বাদশাহের সেই অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

নায়ক বৈজু, তানসেন প্রভৃতি স্মরণীয় সংগীতজ্ঞগণের গুরু স্বামীজী যে কত উচ্চস্তরের গায়ক ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। ভারতীয় সংগীত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁহার অতুলনীয় দান তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। বৃন্দাবনে প্রতি বৎসর হরিদাস স্বামীর তিরোভাব তিথি সংগীত-উৎসবের মাধ্যমে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। ঐ উৎসবোপলক্ষ্যে সংগীতজ্ঞগণ তাঁহারি রচিত সংগীত গাহিয়া থাকেন। সেই উৎসবের সময় স্বামীজীর ব্যবহৃত জিনিষ পত্রাদি জনগণ সমক্ষে উপস্থিত করা হয়—স্বামীজীর ব্যবহারের ভোজন পাত্র ইত্যাদি তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ৯৫ বৎসর বয়সে স্বামী হরিদাস বৃন্দাবনস্থিত নিধুবনে দেহ রক্ষা করেন। তথায় অদ্যাপি তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে।

তানসেন—ষোড়শ শতাব্দী

গোয়ালিয়র হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী বেহট নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে মুকুন্দরাম পাণ্ডে (মকরন্দ পাণ্ডে) নামে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সুপণ্ডিত ও খ্যাতনামা গায়ক ছিলেন। তিনি বারাণসীতে ছিলেন—তথায় কথকতা করিতেন। তাঁহার পত্নী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। পুত্র তানসেনের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহাদের অনেক সন্তান জন্মিয়াছিল। কিন্তু সকল সন্তানই পর পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পত্নীর মৃতবৎসা দোষ থাকায় মুকুন্দরামের মনে বড়ই দুঃখ ছিল। যাহা হউক মুকুন্দরাম সংবাদ পান যে গোয়ালিয়রে মহম্মদ গউস নামে এক সিদ্ধ পীর মৃতবৎসা দোষ দূর করিতে পারেন। মুকুন্দরাম উক্ত পীরের শরণাপন্ন হইলে পীর সাহেব তাঁহাকে একটি কবচ দেন। মুকুন্দরামের পত্নী ঐ কবচ ধারণ করিলে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে তানসেন (তন্না মিশ্র অথবা রামতনু) এর জন্ম হয়। উক্ত জন্ম-সাল সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। ঐ সাল কাহারো মতে ১৫২০ কাহারো মতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ।

বাল্যকালে তানসেন তাঁহার পিতামাতার সহিত বারাণসী ধামে বাস করিতেন। বালক তানসেনের এক আশ্চর্য ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। তিনি বিভিন্ন জীব জন্তুর আওয়াজ ও যে কোন ও স্বর অনায়াসে অনুকরণ করিতে পারিতেন। তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। এই সময় স্বামী হরিদাস শিষ্যমণ্ডলী সহ বারাণসী তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বারাণসী সহরের সীমায় আসিয়া পৌছান তখন বালক তানসেন নিকটেই বনের ধারে গরু চরাইতে ছিলেন। শিষ্য পরিবৃত সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া বালক তানসেন একটি বৃক্ষের আড়াল হইতে কৌতুকছলে ব্যাঘ্রের আওয়াজ করিতে সুরু করেন। এই আওয়াজে শিষ্যগণ অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু স্বামীজী শিষ্যগণকে এই আওয়াজ কোথা হইতে আসিতেছে তাহার অনুসন্ধান লইতে নির্দ্দেশ দেন। শিষ্যগণ অত্যল্প সময় মধ্যেই বৃক্ষের আড়ালে বালকটিকে আবিষ্কার করিয়া তাহাকে স্বামীজীর সম্মুখে উপস্থিত

করেন। স্বামীজী ঐ বালকের রূপলাবণ্য ও সিদ্ধ জনোচিত লক্ষণাদি দেখিয়া এবং তাঁহার অসাধারণ অনুকরণ শক্তির পরিচয় পাইয়া বালক তানসেন সহ তাঁহার পিতা মুকুন্দরামের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তানসেনকে সঙ্গীত শিক্ষা দানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে মুকুন্দরাম সানন্দে আপন পুত্র তানসেনকে স্বামীজীর হস্তে অর্পণ করেন। দশ বৎসর বয়স্ক তানসেনকে লইয়া স্বামীজী বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই ভাবে অমর গায়ক তানসেনের সঙ্গীত-জীবনের সূত্রপাত হয়। একাদিক্রমে দশ বারো বৎসর কাল স্বামীজীর নিকট একনিষ্ঠভাবে সঙ্গীত-শিক্ষা লাভ করিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা গোয়ালিয়রে মরণাপন্ন আছেন সংবাদ পাইয়া তানসেন গুরুদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গোয়ালিয়রে পিতার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মুকুন্দরাম তানসেনকে বলিলেন "আমি যাঁহার কৃপায় তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়াছি,—আমার মৃত্যুর পর তুমি সেই পীর সাহেব মহম্মদ গউসের সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ করিও"। পিতার আদেশানুসারে তানসেন পিতার মৃত্যুর পর যথাসময়ে পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পীর সাহেব মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় অতুল সম্পত্তি তানসেনকে দান করিয়া যান।

অনতিকাল মধ্যেই গোয়ালিয়রের মহারাজা মানসিংহের বিধবা পত্নী মৃগনয়নীর সহিত তানসেনের পরিচয় ঘটে। রাণী তানসেনের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ ও তৎপ্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ও প্রীতিপরায়ণ হন। এই সময় রাণী মৃগনয়নী-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-বিদ্যাপীঠের বিদ্যার্থিনী সুকন্ঠী জনৈকা হুসেনী ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি তানসেন আকৃষ্ট হন। এই ব্রাহ্মণ কন্যার পিতা ছিলেন সারস্বত ব্রাহ্মণ। তিনি সপরিবারে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তদীয় কন্যা প্রেমকুমারী "হুসেনী ব্রাহ্মণী" বলিয়া পরিচিত হন। রাণী মৃগনয়নীর মধ্যস্থতায় এবং পীর সাহেব মহম্মদ গউসের পৌরোহিত্যে ইহার সহিত তানসেনের বিবাহ সংঘটিত হয়। বিবাহের পূর্বে তানসেনকে স্বভাবতঃই ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আতা আলী খাঁ নাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই বিবাহে

মহারাণী মৃগনয়নী এবং পীর সাহেব তানসেনকে যথেষ্ট ধনরত্ন যৌতুক হিসাবে দান করেন। বিবাহের পর তানসেন পুনরায় বৃন্দাবনে গুরুদেব স্বামী হরিদাসের সহিত মিলিত হন এবং বিবাহাদি যাবতীয় বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করেন। উদার দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজী তানসেন ও আতা আলী খাঁর মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখিতে পাইলেন না। এবং পূর্বের ন্যায়ই যত্নসহকারে তাঁহাকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন এবং শিক্ষা দান কার্য্য সম্পূর্ণ করেন। তানসেন মুসলমান হইয়াও প্রগাঢ় গুরুভক্তি হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইলেন না। গুরুর দীক্ষা ও শিক্ষা তাঁহাকে সঙ্গীত সাধনার উচ্চতম শিখরে উন্নীত করিয়াছিল।

তানসেন গুরুর নিকট হইতে শতাধিক ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন এবং গুরুর নিকটেই যৌগিক উপায়ে স্বর-সাধনার কৌশল প্রাপ্ত হইয়া সঙ্গীতে যোগসিদ্ধ হন। রেওয়ার মহারাজা রাজারাম বৃন্দাবন ধামে তানসেনের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়া স্বীয় দরবারে সভাগায়ক নিযুক্ত করেন। উক্ত সময়ে তানসেন রাজারামের নামে বহু গান রচনা করেন। তৎকালে দিল্লীর সিংহাসনে বাদ্‌শাহ আকবর অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহার সহিত রাজারামের গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। বিশেষ কার্যোপলক্ষে আকবর একদা রেওয়া রাজ্যে আসেন ও তানসেনের গানে তিনি এত আত্মহারা হন যে রাজারামকে অনুরোধ করিয়া তানসেনকে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে আনিয়া সসম্মানে স্বীয় দরবারে গায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আকবর বাদশাহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আপন দরবারের নবরত্ন মধ্যে তানসেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নের মর্য্যাদা দান করেন। তানসেন যে দরবারের শুধু শ্রেষ্ঠতম রত্নই ছিলেন তাহা নহে, আকবরের সর্বাধিক অন্তরঙ্গ মিত্রও ছিলেন। প্রভাত কালে ও সন্ধ্যায় কি দরবারে কি অন্তঃপুরে তানসেনের সঙ্গীত ছিল আকবরের নিত্যসঙ্গী। তানসেন ভিন্ন আকবরের এক মুহূর্তও চলিত না। তানসেনের গান শুনিতে শুনিতে একদা আকবর এমন আত্মহারা হইয়া পড়েন যে পারিতোষিক স্বরূপ স্বীয় কণ্ঠের মণিহার তানসেনের কণ্ঠে পরাইয়া দেন ও তাঁহাকে তানসেন উপাধিতে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করেন।

তানসেনের জীবনকে আশ্রয় করিয়া বহু গল্প বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আকবরের সভার অপরাপর গায়কগণ তানসেনের প্রতি বাদশাহের অযাচিত অনুগ্রহে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন এবং তানসেনকে নির্য্যাতন করিবার নিমিত্ত এক ষড়যন্ত্র করেন। দীপক রাগ গাহিলে শরীরে অগ্নি সঞ্চারিত হইয়া জীবন নাশ করিতে পারে এবং সিদ্ধ গায়ক ভিন্ন অপরের পক্ষে এই রাগ গাওয়া সুসাধ্য নহে এই কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং দুরভিসন্ধি মূলে তাঁহারা তানসেন দ্বারা দীপক রাগ গাওয়াইবার নিমিত্ত বাদশাহকে পীড়াপীড়ি করিলে তানসেন ঐ রাগের প্রাণনাশী শক্তির বিষয় আকবরকে জানাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও আকবর ঐ রাগ শুনিবার জন্য জেদ করেন। আকবর কর্ত্তৃক দীপক রাগ গাহিতে এই ভাবে আদিষ্ট হইয়া তানসেন গাহিতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বায়ুমণ্ডল তখন এত উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে বাদশাহ স্বয়ং এবং দরবারের অপরাপর গায়ক, বাদক ও যাবতীয় শ্রোতৃগণ তথা হইতে দূরে পলায়ন করিয়া নিজ নিজ প্রাণ বাঁচান। তানসেন আপন প্রাণ রক্ষার্থ দ্রুত নিজ বাটীতে গমন করিলে তাঁহার কন্যা সরস্বতী ও তদীয় গুরুভগ্নী রূপবতী মেঘ রাগ গাহিয়া তানসেনের প্রাণ রক্ষা করেন। প্রাণ রক্ষা পাইলেও তানসেন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। ইহাতে আকবর নিজের ভুলের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন।

আরও একটি গল্প প্রচলিত আছে যে—একদা আকবর তানসেনকে বলেন "তানসেন, তুমি এত মধুর গান কর, তোমার গুরুদেবের গান আরও কত মধুর, আমি তাঁহার গান শুনিতে ইচ্ছা করি"। তানসেন বলিলেন "আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেই স্বামীজীর গান শোনা সম্ভব হইবে"। বাদশাহ তাহাতেই রাজী হইয়া তানসেন সহ বৃন্দাবনে যান এবং ছদ্মবেশে স্বামীজীর গান শোনেন। গান শুনিয়া আকবর এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে স্বামীজীকে প্রচুর ধনরত্ন দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং দিল্লী যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

কিন্তু স্বামীজী বিষয় ও অর্থের সহিত সম্পর্কহীন সন্ন্যাসী বলিয়া ধনরত্ন গ্রহণ করিলেন না এবং দিল্লী যাওয়ার জন্য অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। আকবর তানসেন সহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তানসেনের জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। এরূপ জানা যায় যে আকবর একদা বেলা দ্বিপ্রহরে রাত্রিকালীন কোন রাগ গাহিবার জন্য তানসেনকে অনুরোধ করেন। তানসেন সঙ্গীত আরম্ভ করিলে সেই স্থান নৈশ অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া যায় এবং গানের স্বর যতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল ততদূর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তানসেনের সঙ্গীতে বহু প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি দূরীভূত হইত বলিয়া শোনা যায়। এরূপ বহু কিংবদন্তী বর্ত্তমান আছে।

সুরৎসেন, শরৎসেন, তরঙ্গসেন ও বিলাস খাঁ নামে তানসেনের চারি পুত্র ও সরস্বতী নামে এক কন্যা ছিল। সিংহল গড়াধিপতি সমুখন সিংহের পুত্র আকবর বাদশাহের সভার প্রসিদ্ধ বীণকার মিশ্রী সিংহের সহিত তানসেন-দুহিতা সরস্বতীর বিবাহ হয়। বিবাহের পর মিশ্রী সিংহের ইস্লামী নাম হয় নওয়াৎ খাঁ তানসেনই এই নামকরণ করেন। তানসেনের পুত্রগণ সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন। তানসেনের অনুরোধে আকবর বাদশাহ তানসেনের পুত্রগণকে আপন দরবারে নিযুক্ত করেন এবং প্রত্যেকের মাসিক বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বিলাস খাঁ ই বিশেষ ব্যুৎপন্ন বলিয়া আকবরের সমধিক প্রিয় পাত্র হন। এই সময় তানসেন আকবর বাদশাহের দরবার হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বাদশাহ তানসেনকে মাসিক দুই হাজার টাকা অবসরকালীন বৃত্তি দিতেন। তানসেন ক্রমে জরা ও বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হইয়া অন্তিম দশায় উপনীত হইলে চারি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার শবের পার্শ্বে বসিয়া গান করিও। "তখন যাহার গানের সময় আমার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত হইবে, তাহারই বংশে সঙ্গীত সাধনা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে জানিও"। অতঃপর তানসেনের মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহকে ঘিরিয়া তদীয় পুত্রগণ অপরাপর গুণীদিগের সহিত গান

গাহিতে থাকেন। কিন্তু সকলেরই গান ব্যর্থ হয়। সর্বশেষে তানসেনের কনিষ্ঠপুত্র বিলাস খাঁ টোড়ী রাগিণীর "কউন ভ্রম ভুলো রে মন অজ্ঞানী" ধ্রুপদ গানটি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তানসেনের দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত হয় —এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে অশীতিবৎসর বয়সে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক তানসেনের আত্মা অমর ধামে প্রয়াণ করে। যশের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াও তানসেন ছিলেন নিরহংকার। ধর্ম্মাশ্রয়ী শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-সাধক তানসেন সঙ্গীতজগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন।

তানসেনের মৃত্যু হয় দিল্লীতে, কাহারো কাহারো মতে আগ্রায়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাদশাহের নিকট গোয়ালিয়র যাইবার আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে আশঙ্কায় বাদশাহ তাঁহাকে গোয়ালিয়র যাইতে দেন নাই। যাহা হউক তানসেনের শেষ ইচ্ছানুসারে গোয়ালিয়রে তাঁহার শব লইয়া গিয়া পীর মহম্মদ গউসের কবরের নিকট সমাহিত করা হয়। বাদশাহ তাঁহার কবরের উপর একটি চন্দ্রাতপ তৈয়ার করিয়া দেন। ইহা অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। তানসেনের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর তাঁহার কবরের নিকট ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়কগণ মিলিত হইয়া তানসেন রচিত গান গাহিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট যন্ত্রীগণ যন্ত্রাদিও বাজাইয়া থাকেন। তানসেনের কবরের উপরেই একটি তেঁতুল বৃক্ষ আছে। গায়কদিগের বিশ্বাস, ঐ তেঁতুল পাতা খাইলেই গলার স্বর সুমিষ্ট হয়—এই বিশ্বাসে বহু গায়ক ঐ তেঁতুল পাতা খাইয়া থাকেন। তানসেন বহু রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দরবারী কানাড়া, মিঞা কি তোড়ী, মিঞা কি মল্লার, মিঞা কি সারঙ্গ ইত্যাদি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ধ্রুপদ গানকে অতি উচ্চ স্তরে উন্নীত করেন। সর্বভারতে তাঁহার গান ছড়াইয়া পড়ে এবং বহু সঙ্গীত-সাধক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে খোদাবক্স, মহম্মদ আলীখাঁ, রামদাস, সুরদাস, জ্ঞান খাঁ, দরিয়া খাঁ, মহবৎ খাঁ, খাণ্ডে রাও, চাঁদ খাঁ, সূরজ খাঁ, রমজান্, লাল খাঁ, নিজাম খাঁ, হুসেন খাঁ, শোভা খাঁ, বীর মণ্ডল, মলিল খাঁ,

চঞ্চল শশী, ভীম রাও, তাজ বাহাদুর, ভগবান দাস, তান তরল, মান তরল ইত্যাদি। ইঁহাদিগের মধ্যে শেষোক্ত তান তরল ও মান তরল তানসেনের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন এবং তানসেন তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তানসেনের পুত্রগণ ও জামাতা মিশ্রী সিং তানসেনের শিষ্যগণ অপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন ছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। হিন্দুস্থানের যাবতীয় গায়ক ও বাদক উত্তরাধিকার সূত্রে তানসেনের সঙ্গীতের কিছু না কিছু পাইয়াছেন। তানসেন কণ্ঠ-সঙ্গীতের গায়ক হইলেও যন্ত্র সঙ্গীতেও তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। রবাব বা রুদ্রবীণা তাঁহারই সৃষ্টি। তানসেন এই যন্ত্রের মাত্র স্রষ্টাই নহেন তিনি স্বয়ং রবাব যন্ত্রের শ্রেষ্ঠ বাদকও ছিলেন। তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ পিতার ন্যায় একজন উৎকৃষ্ট রবাবী ছিলেন।

তানসেন-দুহিতা সরস্বতী ও তাঁহার স্বামী মিশ্রী সিং এই দুইটি সঙ্গীত প্রতিভার মিলনে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শাহ সদারঙ্গ, নির্মল শাহ ও উজীর খাঁর ন্যায় সঙ্গীতের যুগপ্রবর্ত্তকদিগের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল।

উজীর খাঁ তানসেনের দৌহিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রামপুর দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বীণকার ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে পৌত্র ধ্রুপদীয়া ও বীণকার ওস্তাদ দবীর খাঁ সাহেব এখন বর্ত্তমান আছেন।

মীরাবাঈ—ষোড়শ শতাব্দী

রাজস্থানের যোধপুর রাজ্যের কুড়কী—গ্রামে ১৫৫৫ মতান্তরে ১৫৫৬ সম্বতে রাঠোর বংশে তাঁহার জন্ম হয়। অল্প বয়সে ইনি মাতার সহিত কোন একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে গিয়াছিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া মা'কে জিজ্ঞাসা করেন "আমার বর কে"? এই প্রশ্নের উত্তরে মাতা গৃহস্থিত শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্ত্তি দেখাইয়া বলেন "এই যে তোমার বর"। সেই হইতেই মীরা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া কৃষ্ণ সেবায় মন প্রাণ অর্পণ করিলেন। শৈশবেই মীরার মাতৃবিয়োগ ঘটে। অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী অশেষ সদ্গুণশালিনী ও পরম-ভক্তিমতী মীরা বিবাহযোগ্য বয়সে পদার্পণ করিলে ১৫৭৬ সম্বতে মেবারের রাণা ভোজরাজ মতান্তরে রাণাকুম্ভের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর অতুল বৈভব রাজ-ঐশ্বর্য্য এবং রাজরাণীর আসনের অধিকারিণী হইয়াও এই সকলের প্রতি মীরার কোনও আসক্তি হওয়া দূরে থাকুক, তিনি উদাসিনীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিবাহ হইলেও একমাত্র গিরিধারীলালকেই প্রভুজ্ঞানে তাঁহার সেবা পূজায় নিমগ্ন থাকিয়া একতারা ও করতাল সহযোগে নৃত্য-সহকারে ভক্তি-সঙ্গীত এবং সাধু সন্তের সঙ্গে ভজন গান করিতেন।

মীরার এই প্রকার বৈষ্ণবোচিত আচার আচরণ রাজান্তঃপুরে সকলেরই বিতৃষ্ণার কারণ হইয়া উঠিল। মেবারের রাজবংশ শাক্ত ছিল সুতরাং রাজমাতা এবং স্বয়ং রাণা মীরার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। রাজপরিবারের অভ্যন্তরে ও বাহিরে মীরার এতাদৃশ আচরণে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। মীরাকে গিরীধারীলালের সেবা পূজা ত্যাগ করিয়া শক্তি পূজায় রত হইবার জন্য বলা হইল; কিন্তু মীরা উক্ত প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি অতিশয় রুষ্ট হইয়া পানীয় বলিয়া এক পেয়ালা বিষ মীরাকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু গিরিধারীলালের কৃপায় বিষ পান করিয়াও মীরা বাঈ এর মৃত্যু ঘটে নাই।

অতঃপর রাণা উত্তেজিত হইয়া মীরাকে গিরিধারীলালের উপাসনা পরিহার করিতে অন্যথায় রাজপুরী পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলে মীরা দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করিলেন। রাজ-রাণী মীরা রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভিখারিণীর বেশ ধারণ পূর্বক কতককাল দীনজনের সেবায় অতিবাহিত করেন। তাহার পর তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া যান। ব্রজভূমিতে গোবিন্দের গুণগান করিয়া কয়েক বৎসর কাটান এবং পরে দ্বারকাধামে উপনীত হইয়া রণছোড়জীর মন্দিরে উপস্থিত হন। তথায় নিত্যই প্রাণের আকুল আবেগ ও গভীর ভক্তি-সহকারে প্রিয়তম রণছোড়জীকে ভজন গান শুনাইতে থাকেন। এই সময় হরিভক্তি-পরায়ণা মীরার নাম সর্ব্বভারতে ছড়াইয়া পড়ে। এই সংবাদ মেবারে পৌঁছিলে রাজ-পরিবারবর্গ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারেন এবং মীরাকে পুনরায় সসম্মানে মেবারে পাঠাইবার নিমিত্ত দ্বারকাস্থিত ব্রাহ্মণগণকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। কিন্তু মীরা রণছোড়জীর মন্দির পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে মীরাকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত যখন অত্যধিক পীড়াপীড়ি করা হইতেছিল তখন মীরা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইয়া ভজন গান করিতে থাকেন এবং রণছোড়জীর বিগ্রহের সহিত লীন হইয়া যান। (১৬৩০ বিক্রম—ইংরাজী ১৫৭৩)

———

সুরদাস—ষোড়শ শতাব্দী

ভক্ত সুরদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে মতদ্বৈধ বর্ত্তমান। কাহারও মতে মথুরা জিলান্তর্গত গোবর্দ্ধন পর্বতের সন্নিকটবর্ত্তী পরসৌলী নামক একটি প্রাচীন গণ্ড গ্রামে (১৫৩৫ বিক্রমে বা ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে সুরদাসের জন্ম হয়। মতান্তরে হরি রায় সম্পাদিত "চৌরাশি বৈষ্ণবগণ কী বার্ত্তা" গ্রন্থে দিল্লী-মথুরা রোডের সংলগ্ন বল্লভগড় হইতে একক্রোশ মধ্যে "সীহী" গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ঐ গ্রন্থে ইহা ও উল্লিখিত আছে যে সুরদাস জন্মান্ধ ও অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। কথিত আছে যে মাত্র ছয় বৎসর বয়সে অন্ধের সম্বল একটি যষ্ঠি হস্তে ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি গ্রামে পৌঁছিয়া তিনি একটি পিপুল বৃক্ষতলে আশ্রয় নেন। তথায় সাধু-সন্তগণ প্রায়শঃই আসিতেন। সুরদাস তাঁহাদের নিকট ভক্তি ও জ্ঞানের উপদেশ শুনিতে পাইতেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতেই সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ভজন সঙ্গীতে চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। আশৈশব তিনি সুমধুর সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার গান সকলকেই মুগ্ধ করিত। অষ্টাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি তথায় ছিলেন অতঃপর তিনি মথুরা আগ্রা রোডের নিকটবর্ত্তী "গোধাট্" গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় অদ্যাপি "সুর-কুঠি" নামে একটি কুটীর সুরদাসের স্মৃতি বহন করিতেছে। গোধাটে থাকাকালে তিনি ভগবদ্ বিষয়ে বহু ভজন গান রচনা করিয়া গাহিতেন। এই সময় একদা বল্লভাচার্য্য নামে এক বৈষ্ণব প্রধান তথায় আগমন করিয়া সুরদাসের বিনয়গর্ভ ভগবৎ বিষয়ক ভজন সঙ্গীত শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া সুরদাসকে দীক্ষা দান করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান রচনা করিতে উপদেশ দেন। দীক্ষা গ্রহণান্তে গুরু বল্লভাচার্য্যের সহিত তিনি গোকুলে চলিয়া যান। গোকুল হইতে এক সঙ্গে তাঁহারা গোবর্দ্ধনে গমন করেন এবং সুরদাস তত্রত্য শ্রীনাথজীর মন্দিরে গায়ক নিযুক্ত হন। কিছুদিন মধ্যেই অনতিদূরবর্ত্তী পরসৌলী গ্রামে সুরদাস বসতি স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় বস-বাসের কাল হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত সুরদাস অসংখ্য ভজন গান রচনা করেন। "সুরসাগর"

গ্রন্থে সুরদাস রচিত সহস্রাধিক ভজন গান রহিয়াছে এবং উক্ত গীতসমূহ মধ্যে ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত গাহিবার উপযোগী নানা রাগ রাগিণী ও বিভিন্ন তালের সমাবেশ লক্ষিত হয়। ব্যাকরণের দিক হইতেও তাঁহার সঙ্গীতের ভাষা নির্দ্দোষ ছন্দ বিশিষ্ট ছিল। সুরদাস ভক্ত, কবি এবং গায়ক ছিলেন ; একাধারে এই তিনটি গুণের সমাবেশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। উত্তর ভারতের ভজন-গীতি রচয়িতাগণ মধ্যে সুরদাস সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুরদাসের ভজনের ভক্তিভাব যে কোনও ব্যক্তির হৃদয়কে এক অনির্ব্বচনীয় অপার্থিব রসে সিক্ত করে। সুর-সাধক সুরদাস আনুমানিক ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ করেন।

সোমনাথ—ষোড়শ—সপ্তদশ শতাব্দী

আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজমহেন্দ্রী নগরে পণ্ডিত সোমনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুদ্রল পণ্ডিত। তিনি দানবীর, ধর্মনিষ্ঠ ও বিদ্বান ছিলেন। সোমনাথ কেবল সংগীতেই পারদর্শী ছিলেন না উপরন্তু সংগীত-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার সময় সংগীত শাস্ত্র ও তৎকালে প্রচলিত সংগীত পদ্ধতির মধ্যে মতভেদ ছিল। প্রচলিত সংগীত পদ্ধতির সংস্কার সাধনের জন্য তিনি আনুমাণিক ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে "রাগ বিবোধ" নামক সংগীতগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। জনসাধারণের নিকট ইহাকে সহজবোধ্য করিবার জন্য তিনি স্বয়ং ইহার টীকা লিখিয়া নিজের গ্রন্থোক্ত মতের সমর্থনে অপরাপর সংগীত গ্রন্থের মত উল্লেখ করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বীণবাদক ছিলেন এবং "রাগ বিবোধ" গ্রন্থে বীণা বাদন সম্বন্ধে নূতন তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। দক্ষিণ দেশীয় সংগীত বিষয়ে ইহা একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন এবং সংগীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পণ্ডিত অহোবল—সপ্তদশ শতাব্দী

বিখ্যাত সংগীত গ্রন্থ "সংগীত পারিজাত" রচয়িতা পণ্ডিত অহোবল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণের মতে তিনি দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তদীয় পিতা পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ, পুত্র অহোবলকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদান করেন। অতঃপর অহোবল সংগীত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন এবং দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়া ঘনবড়নগরে বসবাস করিতে থাকেন। সেই সময়ে তিনি উত্তর ভারতীয় সংগীতে মনোনিবেশ করেন এবং লোচন পণ্ডিত ও অপরাপর পণ্ডিতগণ-লিখিত সংগীত শাস্ত্র পাঠে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ক্রমে তিনি উত্তর ভারতীয় সংগীতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। ঘনবড় নগরের রাজা অতিশয় সংগীতপ্রিয় ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি গুণীজনের সমাদর জানিতেন। পণ্ডিত অহোবলের সংগীত-দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি পণ্ডিত অহোবলকে তাঁহার দরবারের গায়ক নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন। আনুমানিক ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত অহোবল উত্তর ভারতীয় সংগীতকে কেন্দ্র করিয়া প্রসিদ্ধ সংগীতগ্রন্থ "সংগীত পারিজাত" রচনা করেন। এই গ্রন্থখানিকে উত্তর ভারতের পণ্ডিতগণ সংগীতের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতিদান করিয়াছেন। বীণার তারের উপরে ১২টী স্বরের স্থান সম্বন্ধে পণ্ডিত অহোবলই এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ ইহা মানিয়া লইয়াছেন।

পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী—সপ্তদশ শতাব্দী

পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী "চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা"র গ্রন্থকার। তাঁহার অপর নাম ব্যঙ্কটেশ, পিতার নাম গোবিন্দ দীক্ষিত এবং মাতার নাম নাগমাম্বা। উক্ত গোবিন্দ দীক্ষিত নায়ক বংশের শেষ রাজা বিজয় রাঘবের দেওয়ান ছিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরে। ঐতি-

হাসিকদের মতে রাজা বিজয় রাঘব ১৬৬০ ইং সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা সাহিত্য ও ললিতকলানুরাগী ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ব্যঙ্কটেশকে আপন দরবারের গায়ক নিযুক্ত করেন। গভীর সংগীত সাধনা ও অনুকূল পরিবেশ এই দুটির সহায়তায় ব্যঙ্কটেশ চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা গ্রন্থ প্রনয়ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতে সংগীত-শাস্ত্রের মধ্যে ব্যঙ্কটেশের রচিত গ্রন্থ শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। ব্যঙ্কটেশের গুরুর নাম শ্রীতানপ্পাচার্য্য। ইনি গুরু পরম্পরা শার্ঙ্গদেবের সম্পর্কিত। ব্যঙ্কটেশ তদীয় গুরুর নিকট সম্যক অধ্যয়ন ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আরভী রাগে গুরু বর্ণন বিষয়ে "গন্ধর্ব জনতা খর্ব" নামে এক গীত রচনা করেন। এই গীত আজও পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে। ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঞ্জোর রাজ্যে এই সংগীতবিদের মৃত্যু হয়। উক্ত পণ্ডিত ব্যঙ্কটেশই পরে পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী নামে পরিচিত হন।

—·—

দামোদর—সপ্তদশ শতাব্দী

পণ্ডিত দামোদরের পিতার নাম পণ্ডিত লক্ষ্মীধর। দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ই (১৬২৫ ইং) পণ্ডিত দামোদরের আবির্ভাবকাল। ঐ সময়েই তিনি সংগীত-দর্পণ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের ছয়টি অধ্যায়ে তিনি সংগীতের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। অধ্যায় সমূহের নাম যথা—স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, প্রবন্ধাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায়, তালাধ্যায় ও নৃত্যাধ্যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্বর সমূহকে তথা শ্রুতিস্থান বিষয়ে বিশেষ মহত্ত্ব দেওয়া হইত না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত দামোদর 'সা' ও 'পা'কে অচল স্বর মানিয়া লইয়া সংগীতে বহু পরিবর্ত্তন সাধন করেন। তাঁহার বংশের পূর্বপুরুষগণ বা তাঁহার নিজের নিবাসস্থান সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। পণ্ডিত দামোদর-রচিত "সংগীত দর্পণ" ফার্সি, গুজরাটী ও হিন্দীভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

শ্রীনিবাস—অষ্টাদশ শতাব্দী

সঙ্গীতবিদ্বান শ্রীনিবাস "রাগতত্ত্ববিবোধ" নামক সঙ্গীত-গ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাত হন। অহোবল লিখিত সুবিখ্যাত সঙ্গীত-গ্রন্থ সঙ্গীত পারিজাতের অস্পষ্ট ও বিনষ্ট অংশগুলিকে শ্রীনিবাস তদীয় রাগতত্ত্ববিবোধ গ্রন্থে যথাক্রমে স্পষ্ট ও উদ্ধার করিয়া সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাগে ১২টি স্বরের প্রয়োগ তিনি সমর্থন করিয়া স্বীয় মতের পূর্ণ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীনিবাস পণ্ডিত অহোবলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই চলেন। তাঁহার কাল অষ্টাদশ শতাব্দী বলিয়াই অনুমিত হয় এবং ঐ সময়েই তাঁহার রাগতত্ত্ববিবোধ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল।

শ্রীনিবাস নরপতিপুরের পার্শ্ববর্তী স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ চুরি করার বিদ্যায় পাকা হইয়া উঠেন। এই ভাবে বহু মূল্যবান সঙ্গীত-গ্রন্থ তিনি একত্রিত করেন। একদা তাঁহার গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়া সকল গ্রন্থ বিনষ্ট হয়। এই কারণে শ্রীনিবাসের প্রায় উন্মাদ হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু ব্যঙ্কট রাজা একজন দক্ষিণী পণ্ডিত দ্বারা তাঁহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া তদ্দ্বারা একটি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার মনে শান্তি ফিরাইয়া আনেন। শ্রীনিবাস বরাবর জনসমাজ হইতে দূরে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না।

সদারঙ্গ (নিয়ামত খাঁ)—অষ্টাদশ শতাব্দী

তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় লালখাঁর পুত্র বিখ্যাত বীণকার ও গায়ক, নিয়ামত খাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লীর বাদশাহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিই সদারঙ্গ নামে পরিচিত। বহু খেয়াল গানে "সদারঙ্গিলে মহম্মদ শা"

এরূপ নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমীর খসরু প্রবর্তিত খেয়াল গান তাঁহার সময়ে জনপ্রিয় হয় নাই। খেয়াল গানকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে সুলতান হুসেন শর্কী, রাজ বাহাদুর, চঞ্চল সেন, চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ প্রভৃতি সংগীত-গুণীগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেন নাই। নিয়ামত খাঁ তাঁহাদের এই অসাফল্যের কারণ উপলব্ধি করেন। তিনি অনেক চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে গীত-রচনার মধ্যে বাদশাহের নামের উল্লেখ থাকিলে বাদশাহের আনুকূল্যে খেয়াল গান প্রচারের সুবিধা হইবে। ঐ সময়ে তানসেনের পুত্র-বংশীয় গায়ক এবং রবাবী গোলাব খাঁ মহম্মদ শাহের সংগীত-গুরু রূপে দরবারে সসম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গোলাব খাঁ যখন দরবারে গান গাহিতেন তখন বাদশাহের নির্দ্দেশে নিয়ামত খাঁকে ঐ গানের সঙ্গে বীণা সঙ্গত করিতে হইত। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া নিয়ামত খাঁ দরবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইহার পর ঘটনা অন্যরূপ ধারণ করিল।

একদা পথিমধ্যে মধুর কণ্ঠবিশিষ্ট দুইটি ভিক্ষুক বালকের গান শুনিয়া নিয়ামত খাঁ মুগ্ধ হইয়া যান এবং উক্ত বালকদ্বয়কে স্বীয় বাসস্থানে আশ্রয় দেন ও তাহাদিগকে ক্রমাগত দুই বৎসরকাল সযত্নে খেয়াল গান শিক্ষা দেন। মহম্মদ শাহ মন্ত্রী-মুখে উক্ত ভিক্ষুক বালকদ্বয়ের সংগীতের সুখ্যাতি শুনিতে পাইয়া তাহাদিগকে দরবারে গান গাহিবার জন্য আহ্বান করেন। উক্ত বালকদ্বয়ের অভিনব প্রণালীর গানে বাদশাহ মুগ্ধ ও অভিভূত হন। নিয়ামত খাঁ তাহাদের গুরু ইহা জানিতে পারিয়া বাদশাহ নিয়ামত খাঁকে সাদর আহ্বান জানান ও তাঁহাকে স্বীয় দরবারে শ্রেষ্ঠ গুণীর আসন দান করেন। দরবারে পুনঃ প্রবেশের পর নিয়ামত খাঁ যে সম্মান লাভ করিলেন সংগীতসম্রাট তানসেনের পর দিল্লীর দরবারে এরূপ সম্মান অপর কেহই পান নাই। অতঃপর গায়ক গোলাব খাঁ'এর সঙ্গে নিয়ামত খাঁ'কে আর বীণা-সঙ্গত করিতে হইত না। পরন্তু বাদশাহের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা উত্তরোত্তর এত গভীর হইল যে বাদশাহ নিয়ামত খাঁকে সখারূপে গ্রহণ করিয়া শাহ উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং নিজ সিংহাসনের পার্শ্বেই

তাঁহার আসন দান করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নিয়ামত খাঁ খেয়াল গানের প্রচারে অসাফল্যের বিষয় চিন্তা করিতে ছিলেন এবং বাদশাহের অনুগ্রহ ভিন্ন এই সংগীতের প্রচার সম্ভব নহে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, সুতরাং "সদারঙ্গ" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া গানের ভিতর নিজ নামের সঙ্গে বাদশাহের নাম জুড়িয়া দিয়া বহু খেয়াল গান রচনা করেন। তাঁহার সেই সকল গান অচিরেই দেশময় প্রচারিত হইতে লাগিল। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তানসেনের বংশধর নিয়ামত খাঁ (সদারঙ্গ) কদাপি নিজ বংশে তাঁহার রচিত কওয়াল গানের শিক্ষা দান করেন নাই; নিজ বংশের ঐতিহ্য নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালের উল্লেখযোগ্য খেয়াল গায়কগণ পূর্বোক্ত ভিক্ষুক সংগীতজ্ঞদিগের বংশধর অথবা তাঁহাদেরই শিষ্য। সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালীয়া আহাম্মদ খাঁ তাঁহাদেরই বংশধর; কওয়ালীরীতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আমরা এই বংশেই পাই। প্রসিদ্ধ খেয়ালী তানরাজ খাঁ, হদ্দু খাঁ, হস্সু খাঁ ও নথ্থু খাঁ প্রভৃতি সকলেই এই ভিক্ষুক বংশেরই শিষ্য।

শাহ সদারঙ্গ খেয়াল গাহিতেন না ধ্রুপদ ও হোরি গাহিতেন এবং বীণায় ধ্রুপদের আলাপ বাজাইতেন। উক্ত ভিক্ষুক বালকদ্বয়কে তিনি বাদশাহের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। ফিরোজ খাঁ (অদারঙ্গ) ও ভূপৎ খাঁ (মহারঙ্গ) নামে সদারঙ্গের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদিগকে তিনি ধ্রুপদ ও বীণা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সদারঙ্গ রচিত কোন কোন গানে তাঁহার পুত্র অদারঙ্গের নাম পাওয়া যায়। সদারঙ্গ অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং নিজে যাহা পাইতেন তাহা মুক্তহস্তে গরীব দুঃখীকে দান করিয়া দিতেন ও স্বয়ং ফকীরের জীবন যাপন করিতেন। খেয়াল সংগীতে সদারঙ্গের নাম চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে এবং খেয়ালগায়কগণ কৃতজ্ঞ চিত্তে চিরকাল তাঁহার অবদান স্মরণ করিবে।

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)—অষ্টাদশ শতাব্দী

রামনিধির পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। হুগলী জিলায় ত্রিবেণীর নিকটে চাপতা গ্রামে ১১৪৮ সালে (১৭৪১খৃঃ) রামনিধির জন্ম হয়। তাঁহাদের আদিবাস ছিল কুমারটুলীতে। শৈশবে রামনিধি চাপতা গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করেন। পরে তাঁহার পিতা পুনঃ কুমারটুলীতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকাকালে রামনিধি একজন ইংরেজ পাদ্রীর নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। ২২ বৎসর বয়সে সুখচর গ্রামে ইহার বিবাহ হয়। অতঃপর প্রতিবেশী দেওয়ান রামতনু পালিতের চেষ্টায় ছাপড়া জিলা কালেক্টরীতে তিনি কেরানী পদ প্রাপ্ত হন। রামনিধি আশৈশব অত্যন্ত সংগীতানুরাগী ছিলেন এবং ভাল গাহিতে পারিতেন। ছাপড়ায় অবস্থান কালে কোনও মুসলমান ওস্তাদের নিকট শোরীমিঞার টপ্পা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল শিক্ষার পর রামনিধির প্রতিভাদর্শনে শিষ্য গুরুকে কখন অতিক্রম করিয়া যাইবে এই ভয়ে ওস্তাদ তাঁহাকে নূতন গান শিক্ষা দানে পশ্চাৎ পদ হইতে থাকেন। ইহা রামনিধির দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সংগীত শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজেই বাংলা টপ্পা রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিলেন। রামনিধি সেই গানে হিন্দুস্থানী রাগরাগিণী ও তাল, লয় সন্নিবেশ করিয়া এক অভিনব শ্রেণীর সংগীত রচনা করিলেন। সেই নূতন ধরণের সংগীত অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং সকলকেই আকৃষ্ট করিল। বিখ্যাত সংগীতগুণী রসুল বক্স রামনিধি রচিত টপ্পা শুনিয়া এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে তিনি এই গান শোরী মিঞার টপ্পা হইতে কোন অংশে ন্যুন নহে এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তিনি বলেন বাংলাদেশে নিধুবাবু রচিত টপ্পার তুলনা নাই, তাঁর গানে সুর ও লয়ের উচ্চাঙ্গের সমাবেশ ঘটিয়াছিল এবং তাঁর গান শোরী মিঞারই গান বলিয়া ভ্রম জন্মে। রামনিধির এই মনোমুগ্ধকর অভিনব সংগীত রচনার পর হইতেই জনসাধারণের নিকট তিনি নিধুবাবু নামে বিখ্যাত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার রচিত গান নিধুবাবুর টপ্পা নামে অভিহিত হয়। ১২৩৫ সালে (১৮২৮ খৃঃ) চৈত্র মাসে ৮৮ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

দাশরথি রায়—উনবিংশ শতাব্দী

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালী গীতিকার দাশরথি রায় (দাশু রায়) বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকটবর্ত্তী বাঁধমুড়া গ্রামে ইংরাজী ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি তদীয় মাতুলালয় পীলাগ্রামে আসিয়া সামান্য বাংলা ও ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষা করেন। অতঃপর অক্ষয়া পাটনী নাম্নী এক স্ত্রীলোকের কবির দলে তিনি গানের বাঁধনদার রূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। এই কারণে তাঁহার মাতুল ও পিতা ক্ষুব্ধ হইয়া দাশরথিকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। তাহাতে দাশরথি অক্ষয়ার দল পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় বন্ধুকে লইয়া নিজেই একটি পাঁচালীর দল গঠন করেন এবং নিজেই গান ও ছড়া বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করেন। এই বার দাশরথির কবি-প্রতিভা বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইল। অত্যল্পকাল মধ্যেই দাশরথির যশঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তৎকালে আবালবৃদ্ধবনিতা দাশরথির পাঁচালী শুনিয়া মুগ্ধ হইত। দাশরথি গান গাহিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং পীলাগ্রামেই পাকা বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে দাশরথির গানের অজস্র প্রশংসাবাদ উঠিল এবং সমাজে তিনি অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। তিনি অন্যূণ ৬০টি পালা রচনা করেন। ১২৬৪ (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার লোকান্তর ঘটে। বাংলার শ্রেষ্ঠ পাঁচালীরচয়িতা হিসাবে দাশরথি রায়কে বাংলাদেশ চিরকাল স্মরণ রাখিবে।

———

যদুভট্ট—উনবিংশ শতাব্দী

যদুনাথ ভট্টাচার্য্য অনুমান ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্য্য একজন উৎকৃষ্ট বীণা বাদক, উচ্চস্তরের কণ্ঠ সংগীতশিল্পী ও মার্গ-সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধ ছিলেন। পিতার নিকট যদুনাথ সেতার ও মৃদঙ্গবাদন শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিং দিল্লী হইতে তানসেন বংশীয় ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও মৃদঙ্গী পীরবক্সকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বিষ্ণুপুরের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার অনুরোধে বাহাদুর খাঁ কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন যুবকের সঙ্গীত শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বাহাদুর খাঁ'র শিষ্যদিগের মধ্যে গদাধর চক্রবর্ত্তী ও রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং রামশঙ্কর বিষ্ণুপুরের রাজদরবারের সভা গায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অমৃতলাল ও যদুভট্ট বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। যদুনাথের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সহিত সেকালের কোনও গায়কের কণ্ঠস্বর তুলনীয় ছিল না বলিয়া যদুনাথ কণ্ঠ-সঙ্গীতের সাধনায়ই মনোযোগী হন এবং পরবর্ত্তীকালে যদুভট্ট নামে পরিচিত হন।

প্রথম যৌবনে যদুভট্ট রামশঙ্করের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন; অতঃপর রামশঙ্করের মৃত্যু হইলে যদুভট্ট গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ধ্রুপদ শিক্ষা আরম্ভ করেন ও সঙ্গীত বিদ্যায় অধিকতর উৎকর্ষ লাভের জন্য কাশী, দিল্লী, গোয়ালিয়র, জয়পুর ও অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করেন। তার ফলে তাঁহার সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। যদুভট্ট কেবল গুরুর নিকট শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই; নানা ঘরোয়ানা এবং নানা ঢংয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নিজস্ব একটি ধারা ও গায়কীর প্রচলন করেন যাহা শ্রোতামাত্রকেই অভিভূত করিত। এই কারণে সারা বাংলা এবং বাংলার বাহিরেও তাঁহার যশঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ২২ বৎসর বয়সে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সঙ্গীত রচনায় মনঃসংযোগ করেন। বাঙ্গালী হইলেও তাঁহার

রচিত হিন্দী ধ্রুপদ গান রচনা নৈপুণ্যে বিখ্যাত হিন্দুস্থানী রচয়িতাদিগের গীত্ত-রচনাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। যদুভট্ট যখন বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন পঞ্চকোটের রাজা তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "রঙ্গনাথ" উপাধি দান করেন।

এই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে যদুভট্ট জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে যাইয়া মহর্ষিকে গান শোনান। তাঁর সংগীতে মুগ্ধ হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। সেই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের সহিত ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের বিশেষ সৌহার্দ্য থাকায় ঠাকুর বাড়ীর মাধ্যমেই যদুভট্ট ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সহিত পরিচিত হন এবং ত্রিপুরায় যান। সেখানে তাঁহার গান শুনিয়া ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যবাহাদুর তাঁহাকে "তানরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সময় তানসেন বংশীয় বিখ্যাত রবাবী কাশীম আলী খাঁ ত্রিপুরা রাজদরবারের রবাব বাদক ছিলেন। তিনি যাহা বাজাইতেন যদুভট্ট তাহা শোনা মাত্র আয়ত্ত করিতেন। এই কারণে কাশেম আলি খাঁ ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ত্রিপুরার মহারাজা বিশেষভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদুভট্ট স্থায়ীভাবে ত্রিপুরা রাজ দরবারে থাকিতে অস্বীকৃত হন।

গৃহশিক্ষক রূপে ঠাকুর বাড়ীতে থাকা কালে যদুভট্ট রবীন্দ্রনাথকে মার্গ-সঙ্গীতে শিক্ষা দান করেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ যদুভট্টের রচিত খাণ্ডারবাণী ও অন্যান্য ধ্রুপদের সুর ও ছন্দ নিয়া বাংলা গান রচনা করেন। ঐ সময় যদুভট্ট কয়েকটি বাংলা ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করেন। তিনি বেশীর ভাগ সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজাকে গান শুনাইয়া আসি-তেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন; তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। যদুভট্ট মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য ও ঠাকুর বাড়ীর সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ গায়কই ছিলেন তাহা নহে, তিনি

হিন্দী ও বাংলা ভাষায় অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনাও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক গান স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় সঙ্গীত-মঞ্জুরী গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যতুভট্ট ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করেন। সেই সময় রামপুর ও গোয়ালিয়র রাজ্যে তাঁহার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়। অনন্যসাধারণ প্রতিভার গুণে যতুভট্ট সর্ব্ব ভারতীয় খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেন, যাহা তৎকালে কোনও বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞের ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই। তাঁহার প্রতিভারশ্মি ভারতীয় সঙ্গীতের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে তিনি বিষ্ণুপুরে প্রত্যাগমন করেন এবং কয়েক মাস রোগশয্যায় থাকিয়া মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যতুভট্টের দান অমর কীর্ত্তিরূপে চিরদিন বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু হইয়া থাকিবে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—উনবিংশ শতাব্দী

১২৫০ সালে ১৫ই ফাল্গুন বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺নীলকমল ঘোষ। শৈশবে পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া তিনি গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ও অতঃপর হেয়ার স্কুলে পড়াশুনা করেন। মাত্র ১১ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতার মৃত্যু ও ১৪ বৎসর বয়সে পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। স্কুল পরিত্যাগ করিয়া চার বৎসর কাল নিজ বাটীতে থাকিয়া তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করেন। এই সময়ই কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিয়া তিনি একটি থিয়েটারের দল গঠন করেন এবং "সধবার একাদশী" পালাটি মঞ্চস্থ করিয়া স্বয়ং নিমচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই সময় হইতেই তাঁহার অভিনেতৃ-জীবনের সূত্রপাত হয়। ঐ সখের থিয়েটারই পরে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং

তাহাতে টিকেট বিক্রীর প্রচলন সুরু হয়। ইহা গিরিশচন্দ্রের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ঐ থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করেন। অতঃপর বিডন ষ্ট্রীটে গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা রূপে যোগদান করেন। কিয়ৎকাল পরে ঐ থিয়েটারেই মাসিক ১০০৲ বেতনে তিনি ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই সময়ই তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন এবং কখনো কখনো কর্ত্তৃত্ব ভার নিয়া, কখনও ডিরেকটার রূপে, বিভিন্ন থিয়েটারে কার্য্য করেন ; তন্মধ্যে ষ্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক প্রভৃতি থিয়েটারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সময় মধ্যে তাঁহার লিখিত বিভিন্ন নাটক বাংলার নাট্যজগতে যুগান্তর সৃষ্টি করে এবং নাট্যকার ও অভিনেতা হিসাবে তাঁহার যশঃ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। উল্লিখিত মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বরাবরই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁহার অনূদিত ম্যাকবেথ্ নাটক ঐ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং তিনি নামভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অভিনেতা হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক কাল্পনিক ও ধর্মমূলক অন্যূণ ৭০ খানি নাটক গীতিনাট্য ও প্রহসন লিখেন। তন্মধ্যে "বিল্লমঙ্গল", "প্রফুল্ল", "গৃহলক্ষী" প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। নাটকাদি লেখার সময় তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা তন্নিযুক্ত লিখক লিখিয়া লইতেন এবং পরে সংশোধিত হইয়া তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাসের তিনি নাট্যরূপ দান করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করেন। এই ভাবে তিনি নাট্যসাহিত্যে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন ও রঙ্গমঞ্চে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া নাট্য জগতের উপর নূতন আলোকসম্পাত করেন। "গৃহলক্ষী" তাঁহার লিখিত শেষ নাটক। বস্তুতঃ বাংলার নাট্য সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের অবদান অতুলনীয়, নাট্যকার রূপে তিনি শীর্ষ স্থানীয় এবং অভিনেতা রূপে তাঁহার প্রতিভা ও দক্ষতা অবিস্মরণীয়।

তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরমভক্ত গিরিশচন্দ্রের প্রতি পরমহংস দেবের অপার স্নেহ ও করুণা গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনে পরম সহায়ক হইয়াছিল এবং গিরিশচন্দ্র পরমহংস দেবের একজন শ্রেষ্ঠভক্তে পরিণত হন। তদীয় ভক্তি-প্রভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশচন্দ্র লিখিত বিল্বমঙ্গল নাটক দেখিতে আসিয়া ষ্টার রঙ্গমঞ্চে বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সমাধিস্থ হন। গিরিশচন্দ্র বিভিন্ন ভাবের বহু গান রচনা করেন। তিনি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ না হইলেও সঙ্গীতে তাঁহার মোটামুটি অধিকার ছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রেরণাই রঙ্গালয়ের নাট্যসঙ্গীতে নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। তাঁহার রচনাতে হাল্‌কা রসের গান যেমন আছে গভীর ভক্তি-মূলক গানেরও অভাব নাই। তাঁর অনেক গানে তিনি স্বয়ংই সুর দিতেন তদ্ভিন্ন তাঁর বহু গানে যাঁহারা সুর দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দেবকণ্ঠ বাগচি, অমৃতলাল দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের গান শুধু নাট্যসংগীত রূপেই যে জনপ্রিয় হইয়াছিল এমত নহে, পরন্তু সংগীতের আসরেও গিরিশচন্দ্রের গান অনেকেই গাহিতেন। তাঁহার গান অদ্যাপি বাংলাদেশে শ্রদ্ধার সহিত গীত হইয়া থাকে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে তিনি দেহ রক্ষা করেন। বাংলার নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের নাম চিরদিন গৌরবোজ্জ্বল থাকিবে।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারয়ণ ভাতখণ্ডে—উনবিংশ শতাব্দী

আজ হইতে কিঞ্চিৎ অধিক একশতবৎসর পূর্বে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে জন্মাষ্টমী দিবসে বোম্বে প্রদেশের বালকেশ্বর গ্রামে এক অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণের জন্ম হয়। শৈশবেই মাতার নিকট তিনি ভজন গান শিক্ষা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রুতিধর বালক একটি বার মাত্র শুনিয়াই যে কোন গানের পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতেন। তাঁহার মধ্যে এই অসাধারণ শক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতামাতা পুত্রের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করেন।

ঘটনাস্রোত ও এই ভাবেই বহিতে থাকে। বিদ্যাশিক্ষা ও সঙ্গীতশিক্ষা উভয় বিষয়েই বিষ্ণুনারায়ণের ছিল সমান অনুরাগ। সুতরাং লেখাপড়া ও সঙ্গীত পাশাপাশি চলিতে লাগিল। তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া উচ্চপ্রশংসা অর্জন করেন এবং বহু পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যালয়ের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কলেজে পড়ার সময় তিনি নিয়মিত ভাবে সংগীত চর্চা করিতে থাকেন। কাশীর বিখ্যাত সেতারী পান্নালাল বাজপেয়ীর সুযোগ্য শিষ্য বল্লভদাসের নিকট তিনি সেতার শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র তিন বৎসর কালের মধ্যেই নিপুণ সেতারবাদক হইয়া উঠেন। এই সময়ে তিনি বিশেষ ভাবে সংগীত-শাস্ত্রেরও চর্চা করেন।

এল, এল, বি পাশ করার পর আইন ব্যবসায় উপলক্ষ্যে তিনি করাচীতে যান কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই বোম্বেতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আইনজীবী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সংগীতচর্চা তখন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বোম্বেতে গিয়াই তিনি "গায়ন উত্তেজক মণ্ডলী" নামক এক সংগীত-সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন এবং তারই মাধ্যমে বিশিষ্ট ওস্তাদ-গণের সংস্পর্শে আসিয়া সংগীত শিক্ষায় নিযুক্ত হন।

উক্ত "গায়ন উত্তেজক মণ্ডলীতে" তিনি প্রায়ই সংগীত সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দিতেন যাহাতে বোম্বে সহরের বিদগ্ধ সমাজ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন বোম্বেতে সংগীতের বহুল প্রচারই ছিল তাঁহার লক্ষ্য বস্তু। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সংগীতের জ্ঞান-পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সংগীত চর্চার ক্ষেত্রও বিস্তৃত হইবার কারণ ঘটে। সংগীতজগৎ যেন চতুর্দ্দিক হইতে হাতছানি দিয়া তাঁহাকে আকুল আহ্বান জানাইতে থাকে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কালবিলম্ব না করিয়া সংগীতের এই পূজারী তাঁহার জীবনের ঐতিহাসিক যাত্রা সুরু করেন এবং প্রথমেই পর্য্যটন ব্যপদেশে দক্ষিণ ভারতে গিয়া উপস্থিত হন এবং পর পর মাদ্রাজ, মহীশূর, তাঞ্জোর, ত্রিবাঙ্কুর ও অপরাপর সংগীত-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া

কর্ণাটী সংগীতের বিশিষ্ট গুণীজ্ঞানীদিগের সহিত মিলিত হন। ঐ সময়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতজ্ঞদিগের সংগীত অভিনিবেশ সহকারে শোনেন ও তথাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যাইয়া প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠ ও তথ্য সংগ্রহের কার্য্যে ব্যাপৃত হন। কর্ণাটী সংগীত সম্বন্ধে সবিশেষ গবেষণা করার সময় তিনি পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখীর ৭২ ঠাট সম্বন্ধে অবগত হইয়া এক নূতন আলোকের সন্ধান পান; এবং তাহার ফলে তৎকালে প্রচলিত রাগরাগিণী-পদ্ধতি পরিহার পূর্বক ঠাট-পদ্ধতি গ্রহণ করেন। উপরোক্ত ৭২টী ঠাট হইতে নিম্নোক্ত ১০টী ঠাট গ্রহণ করিয়া হিন্দুস্থানী সংগীতের যাবতীয় রাগের উৎসরূপে এই ১০টী ঠাটের প্রচলন করেন। ১০টী ঠাট এই—বিলাবল, কল্যাণ, খাম্বাজ, ভৈরব, পূর্বী, মারোয়া, কাফী, আশাবরী, ভৈরবী ও তোড়ী।

অতঃপর তিনি উত্তর ও পূর্ব ভারত পরিভ্রমণে যাত্রা করেন এবং দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মথুরা, বেনারস, গয়া, জয়পুর, যোধপুর ও উদয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া শ্রেষ্ঠ ওস্তাদগণের সংস্পর্শে আসেন। তৎকালে তিনি প্রসিদ্ধ ধ্রুপদীয়া জাকিরুদ্দীনের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক বহু ধ্রুপদ শিক্ষা করেন এবং আসেখ আলী ও মহম্মদ আলীর নিকট তিনশতাধিক খেয়াল গান শিক্ষা করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু ওস্তাদের নিকট গাণ্ডা বাঁধিয়া তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। এই পর্য্যটনকালে সংগীতশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ও ওস্তাদগণের সংগে সংগীতের আলোচনা ক্রমে তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন তৎসমুদয় তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, যাহা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী সময়ে মারাঠী ভাষায় "হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি" নামক গ্রন্থ চারিখণ্ডে প্রকাশ করেন। নানা ভাষায় লিখিত সংগীত শাস্ত্র হইতে তথ্য উদ্ধার করার নিমিত্ত তাঁহাকে সংস্কৃত, হিন্দী, তেলেগু, গুজরাটী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। অবশ্য সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় তিনি পূর্বেই ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

১৯০৭ সালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন। বাংলাদেশে তৎকালে রাজা সৌরীন্দ্রমোহনই ছিলেন সংগীতের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। তিনি বহু সংগীত-গুণীজন বেষ্টিত ছিলেন। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ এই সুযোগে সেই জ্ঞানীগুণীদের সহিত সঙ্গীত সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া লন।

উত্তর ভারত পরিভ্রমণ কালে সেখানকার ওস্তাদদের গান শুনিয়া তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন যে ওস্তাদগণ গানের রাগরাগিণী বা স্বর-প্রয়োগ সম্পর্কে উদাসীন। তিনি তখন এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে সমস্ত রাগরাগিণীকে পূর্বোক্ত বিলাবল প্রভৃতি দশটী ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সুশৃঙ্খল করা আবশ্যক। বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া অক্লান্তকর্মী এই মহাপুরুষ সর্বভারতে মার্গসঙ্গীতের প্রসারের যে মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত এবার তিনি তাঁহার সংগৃহীত গান ও তথ্যাদিকে আশ্রয় করিয়া সংগীত গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি লক্ষণসংগীতম ও অভিনবরাগমঞ্জরী নামক দুইটী গ্রন্থ লিখিলেন। ইহার পরই তিনি "চতুর পণ্ডিত" ছদ্ম নামে হিন্দী ভাষায় লক্ষণগীত রচনায় নিবিষ্ট হন। এই গানগুলিতে রাগের লক্ষণ সম্যকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই লক্ষণগীতগুলি ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁহার নূতন সৃষ্টি ও অমর অবদান।

রাগরাগিণী সম্পর্কে ওস্তাদগণের মতবিরোধ ও তর্কের সমাধানকল্পে ও শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন ঘরোয়ানাকে একটি সর্ববাদী সম্মত নিয়মের অধীন করার উদ্দেশ্যে অতঃপর তিনি সঙ্গীতসম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া ১৯১৫-১৯১৬ সালে বরোদার মহারাজার আনুকূল্যে বরোদাতে তিনি প্রথম সঙ্গীতসম্মেলন (All India Music Conference) আহ্বান করেন। ১৯১৮ সালে রামপুরের নবাব বাহাদুরের নেতৃত্বাধীনে দিল্লীতে দ্বিতীয় বার সংগীত সম্মেলন আহ্বান করেন। এই

ভাবে পর পর বানারস, লক্ষ্মৌ প্রভৃতি স্থানে সংগীত সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। এই সকল সংগীতসম্মেলন উপলক্ষে সংগীত পরিবেশন ও সংগীত বিষয়ে আবশ্যকীয় আলোচনা দ্বারা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরিকল্পনা অতি অল্পকাল মধ্যেই ফলপ্রসূ হয় এবং তাঁহার মহান উদ্দেশ্যকে ক্রমেই সফলতা-অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দেয়।

তিনি বিভিন্ন রাগের ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, তারানা ও লক্ষণগীত প্রভৃতি স্বরলিপি সহ "ক্রমিক পুস্তক মালিকা" ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিতজী অতি সহজবোধ্য এক অভিনব স্বরলিপিপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমানে ভাতখণ্ডেজীর আবিষ্কৃত স্বরলিপিপদ্ধতি সর্বভারতে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। শ্রুতিধর এই মহাপুরুষ যখন যেখানে যে ওস্তাদের গান শুনিয়াছেন তখনই তাহার স্বরলিপি করিয়াছেন। এবং তাঁহার বহু পরিশ্রমে সঞ্চিত সংগীতের সেই মধুচক্র সংগীতপিয়াসী ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে দান করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিতজী ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন যে জগতের শ্রেষ্ঠ এই ভারতীয়-সংগীতকে অস্পূর্য্যম্পশ্য করিয়া রাখিলে চলিবে না। এই সংগীতকে সহজলভ্য করিতে হইবে—তাইতো হিমালয়ের গুহা-মুখ হইতে ভগীরথ গঙ্গাকে আনিয়া যেমন সারা ভারতের অঙ্গ সেই পুণ্য সলিলে ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণও তেমনি যক্ষসদৃশ তৎকালের রক্ষণশীল ওস্তাদগণের কঠোর প্রহরাবেষ্টিত অন্ধকার গুহা হইতে উদ্ধার করিয়া সংগীত-নির্ঝরিণীকে ভারতে আপামর জনসাধারণের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া নিজেও কৃতার্থ হইলেন এবং সকলকে কৃতার্থ করিলেন। তাই আজ শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার সুযোগ ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে। তাঁহারই চিন্তা প্রসূত পরিকল্পনা অনুসারে লক্ষ্মৌতে মরিস কলেজ (বর্ত্তমানে ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ) স্থাপিত হয় এবং তদীয় প্রিয় শিষ্য ও দক্ষিণ হস্তরূপ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের হস্তে তার

কর্ত্তৃত্বভার দেন। তাঁহারই চেষ্টায় বরোদা এবং গোয়ালিয়রে সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী আজ সারা ভারতে অসংখ্য সংগীত-শিক্ষায়তন এমনকি সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় ও গড়িয়া উঠিতেছে।

পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা মুক্ত হস্তে ভারতকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে সর্বভারতে মার্গ-সংগীতের এই প্রসার তাঁহারই দান—এবং এই কারণেই পণ্ডিতজী চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ১৯৩৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর গণেশচতুর্থী তিথিতে এই মহাপুরুষের দেহান্তর হয়।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর—ঊনবিংশ শতাব্দী

১৮৭২ সালে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কুরুন্ধবাড় নামক এক দেশীয় রাজ্যে সঙ্গীতাচার্য্য পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শ্রীদিগম্বর হরিকীর্ত্তন-গায়ক ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেওয়ালী উপলক্ষে আতসবাজী পোড়াইতে গিয়া কিশোর বিষ্ণুদিগম্বরের চক্ষু খারাপ হয় এবং তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে মীরাজে শ্রীবালকৃষ্ণ বুওয়ার নিকট সঙ্গীত শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন। সেখানে তিনি সর্বপ্রকার সঙ্গীতের জ্ঞান অর্জ্জন করেন। তিনি তদীয় সঙ্গীতগুরুর সঙ্গে নানা সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত থাকিয়া সঙ্গীত পরিবেশন পদ্ধতি বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। সঙ্গীত-শিক্ষার্থী থাকা কালে তিনি সর্বদা গুরুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যা করেন এবং একনিষ্ঠভাবে সঙ্গীতের সাধনা করেন ও সর্বপ্রকার বিলাস বর্জ্জন করিয়া চলেন। ১৮৯৬ সালে পণ্ডিতজী সঙ্গীত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া

মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন গ্রাম পর্য্যটন করেন এবং তত্নপলক্ষে তৎকালীন সঙ্গীতের গায়কীর চরম শোচনীয়তা উপলব্ধি করেন ; আর ইহাও লক্ষ্য করেন যে সমাজে সঙ্গীতকে যোগ্য আদর ও সম্মান দেওয়া হইতেছেনা। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি তাঁহার অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল এবং তিনি সংকল্প করিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত সঙ্গীত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও গুণিগণ মধ্যে সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত না হইতেছে ততদিন তিনি বিন্দুমাত্র বিশ্রাম করিবেন না। তিনি এই উদ্দেশ্য সাধন করার নিমিত্ত সঙ্গীতে শৃঙ্গার রসের ভাষা বর্জন করিয়া ভক্তিরসাশ্রিত বাণী সহযোগে গীত-রচনাপূর্বক সঙ্গীত প্রচারে ব্রতী হন। ইহার ফলে সমাজে তাঁহার ভক্তিমূলক সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে এবং নানা স্থান হইতে তাঁহার নিকট আমন্ত্রণ আসিতে থাকে। এই প্রকারে কীর্ত্তন ও ভজন গানের প্রচার ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তিনি স্বীয় চরিত্র ও সদগুণাবলীর নিমিত্ত লাহোরের বিশিষ্ট নাগরিকগণমধ্যে নিজের স্থান করিয়া লন এবং ১৯০১ সালে তথায় গান্ধর্ব মহাবিত্থালয় নামে একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁহার জীবনের অর্জিত সমুদয় অর্থ তিনি ঐ মহাবিত্থালয়ে দান করেন। কিন্তু অর্থাভাবহেতু প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সুচারু রূপে চলিতে পারে নাই। এই সময় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। তৎসত্ত্বেও তিনি নিরাশ হন নাই এবং সব সময় উক্ত সঙ্গীত মহাবিত্থালয়ের কাজেই নিযুক্ত থাকিতেন। কিছুদিন পর্য্যন্ত সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা খারাপই ছিল কিন্তু স্থানীয় বিচারক শ্রীচ্যাটার্জির আনুকুল্যে শীঘ্রই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে প্রতিষ্ঠানটি শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে এবং সারা পাঞ্জাবে সঙ্গীতের প্রচার উত্তম রূপেই হয়। ১৯০৮ সালে পণ্ডিতজী বোম্বাই সহরে আসেন ও তথায় গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের একটি শাখা স্থাপন করেন। কিছুদিন মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানটি লাহোরের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা উন্নততর অবস্থায় পৌছে। সেই সময় পণ্ডিতজী কোনও বন্ধুর নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু বন্ধুর ঋণ যথা সময়ে পরিশোধ করিতে না পারায় বাড়ীটি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। অতঃপর তিনি রামায়ণ-

গান করিয়া একটি ছোট বাড়ী তৈয়ার করেন এবং ঐ বাটীর সংলগ্ন ভূমিতে একটি রামায়ণ-মন্দিরও স্থাপন করেন। সেই সময় পণ্ডিতজী "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম" এই রামধুনটি স্বয়ং গান করিয়া জনগণ মধ্যে বিশেষভাবে ইহার প্রচার করেন। উক্ত রামায়ণ-মন্দিরে তদীয় শিষ্যগণ অদ্যাপি ভগবদ্বিষয়ক ভজনগান করিয়া থাকেন। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে ভারতবিখ্যাত গায়ক পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর পণ্ডিত বিনায়ক রাও পটবর্দ্ধন, বি, আর, দেওধর, বামনরাও উপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সঙ্গীত বিষয়ে আনুমানিক ৫০ খানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৯৩১ সালের ২১শে আগষ্ট মীরাজ নগরে তাঁহার দেহান্তর ঘটে।

পণ্ডিতজীর সুযোগ্য পুত্র ভারত বিখ্যাত গায়ক ডি, ভি, পলুস্কর বোম্বাই-স্থিত গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে সঙ্গীতের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দুঃখের বিষয় কয়েক বৎসর পূর্বে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

ইনায়েত খাঁ—উনবিংশ শতাব্দী

১৮৮৫ ইং সালে এটোয়া নামক স্থানে ইনায়েত খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুরবাহার ও সেতার যন্ত্রের একজন শ্রেষ্ঠ বাদক ছিলেন। ইহার পিতামহ দাদ খাঁ ধ্রুপদ, খেয়াল ও গজলের একজন বিশেষজ্ঞ এবং জলতরঙ্গ ও সারেঙ্গী বাদ্যে বিশারদ ছিলেন। ইনায়েত খাঁ'র পিতা ইমদাদ খাঁ হিন্দুস্থানের একজন প্রসিদ্ধ সুরবাহার ও সেতার বাদক ছিলেন। জোড় গৎ ও তোড়া প্রভৃতিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। তিনি নওগাঁও ও বানারসের মহারাজার দরবারের বাদক ছিলেন। অতঃপর

কলিকাতায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাবাদক হন ও তারপর তিনি অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে নিযুক্ত হন। পরিশেষে নিজের দুই পুত্র সহ ইন্দোরে বসবাস করিতে থাকেন ও মহারাজার দরবারে নিযুক্ত হন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। দুই পুত্রমধ্যে বড় বহীদ খাঁ ও ছোট ইনায়েত খাঁ। ইনায়েত খাঁ শিশুকাল হইতে আপন পিতার নিকট ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুমরী প্রভৃতিতে তালিম প্রাপ্ত হন। অতঃপর পিতার নিকটই সুরবাহার ও সেতার বাদ্যের শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্বীয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কলাকারে পরিণত হন। তিনি পর পর কাথিয়াবাড়, মহীশূর, বরোদা ও ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে সংগীত প্রসার ব্যপদেশে ছিলেন—তাহার পর তিনি কিছুকাল গৌরীপুরের (ময়মনসিংহ) স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর সভাবাদক ছিলেন। অতঃপর তিনি নানা স্থানে বহু সংগীত সম্মেলনে যোগদান করিয়া বহু স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। সারা ময়মনসিংহ জিলাতে তাঁহার বহু শিষ্য বর্ত্তমান। ১৯৩৯ ইং সালে তাঁহার দেহান্তর হয়। তাঁহার পুত্র বিলায়েত খাঁ বর্ত্তমানে একজন সুদক্ষ সেতারী। ইনি গৌরীপুরের ঘরোয়ানাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।
